দু-হারা

নূর-ই-চশ্‌ম্‌

শ্রীমান সৈয়দ জগলুল আলীর

করকমলে—

দু-হারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বরোদার বিখ্যাত মহারাজা সয়াজী রাওয়ের কাছে আমি চাকরি নিয়ে যাই। শহরের আকার ও লোকসংখ্যা গুজরাতের অন্যান্য শহরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু স্বাধীন রাজ্য বলে ছোটখাটো মিউজিয়াম, তোষাখানা, চিড়িয়াখানা, রাজপ্রাসাদ, পালপরবে গাওনা-বাজনা এবং আর পাঁচটা জিনিস ছিল বলে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পাশের ধনী শহর আহমদাবাদের তুলনায় এর আপন বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ আর আমার ঠিক মনে নেই, মহারাজা নিজে মদ না খেলেও তাঁর ক'টি ছেলে দিবারাত্র বোতল সেবা করে করে বাপ-মায়ের চোখের সামনে মারা যান। ওঁদের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য কিছুদিনের তরে তিনি তাবৎ বরোদা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ড্রাই করে দেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফলোদয় হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাকি ছিলেন একমাত্র ধৈর্যশীল রাও। এঁকেও সাদা চোখে বড় একটা দেখা যেত না।

মহারাজার বড় ছেলের ছেলে—তিনিই তখন যুবরাজ—প্রতাপসিং রাও-ও প্রচুর মদ্যপান করতেন—এ নিয়ে বুড়া মহারাজার বড়ই দুঃখ ছিল—কিন্তু নাতি তখনো দু'কান কাটা হয়ে যান নি। রাজা হওয়ার পর তিনিও সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে গেলেন এবং ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আকাট মূর্খ ইয়ারবক্সীর প্ররোচনায় ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন! তিনি গদীচ্যুত হওয়ার পর তাঁর ছেলে ফতেহ্ সিং রাও মহারাজা উপাধি পান—এবং বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বলে অনেকেই তাঁকে চেনেন। শুনেছি, মানুষ হিসেবে চমৎকার।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা।

বুড়া মহারাজার মদ্যের প্রতি অনীহা ছিল বলে বরোদা শহরে সংযমের পরিচয় পাওয়া যেত—বিশেষ করে যখন অন্যান্য নেটিভ স্টেটে মদ্যপানটাই সবচেয়ে বড় রাজকার্য বলে বিবেচনা করা হত, ও প্রজারাও যখন রাজাদর্শ অনুকরণে পরাঙ্মুখ ছিল না।

কিন্তু বুড়া মহারাজা বিস্তর বিলাতফের্তা যোগাড় করেছিলেন বলে প্রায়ই কারো না কারো বাড়িতে পার্টি বসত। দু-এক জায়গায় যে মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি হত না, সে কথা বলতে পারি নে। তবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো গৃহকর্তার আপন সংযমের উপর।

এরই দু-একটা পার্টিতে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভুল বললুম, পরিচয় হয়। কারণ এ রকম স্বল্পভাষী লোক আমি জীবনে কমই দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি চুপ করে বসে থাকতেন এক পাশে, এবং অতিশয় মনোযোগ সহকারে ধীরে ধীরে গেলাসের পর গেলাস নামিয়ে যেতেন। কিন্তু বানচাল হওয়া দূরে থাক, তাঁর চোখের পাতাটিও কখনো নড়তে দেখি নি। আমি জানতুম, ইনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দশেক পূর্বে ডক্টরেট পাশ করে বরোদায় ফিরে এসে উচ্চতর পদে বহাল হন। আমিও বন্ থেকে বছর তিনেক পূর্বে পাশ করে আসি ও তিনি যে-সব গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছিলেন আমিও তাঁদের কয়েক-জনের কাছে বিদ্যার্জন করার চেষ্টা করি। আমি তাই আশা করেছিলুম তিনি অন্তত আমার সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলবেন—বন্ বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর সহপাঠী, তাঁর আমার উভয়ের গুরু, রাইন নদী, শহরের চতুর্দিকের বন-নদী-পাহাড়ের পিকনিক নিয়ে তিনি পুরানো দিনের স্মৃতি ঝালাবেন, নিদেন দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। আমি দু-তিনবার চেষ্টা দিয়ে দেখলুম, আমার পক্ষে তিনি বন্ থেকে পাশ না করে উত্তর মেরু থেকে পাশ করে থাকলে একই ফল হত। সাপের খোলসের মত তিনি বন্ শহরের স্মৃতি কোন্ আঁস্তাকুড়ে নির্বিকার চিত্তে ফেলে এসেছেন। আমি আর তাঁকে ঘাঁটালুম না।

এর পর কার্যোপলক্ষে আমি এক-আধবার তাঁর দফতরে যাই। এক্ষেত্রেও তদ্বৎ। নিতান্ত প্রয়োজন হলে বলেন ইয়েস, নইলে জিভে ক্লোরোফরম মেখে নিয়ে নিশ্চুপ।

বাড়ি ফিরে এসে তাঁর থীসিসখানা যোগাড় করে নিয়ে পড়লুম। অত্যুৎকৃষ্ট জর্মনে লেখা। নিশ্চয়ই কোনো জর্মনের সাহায্য নিয়ে। তা সে আমরা সবাই নিয়েছি এবং এখনো সর্ব অজর্মনই নিশ্চয়ই নেয়, কিন্তু ইনি পেয়েছিলেন সত্যকারের জউরির সাহায্য। তবে তিনি এখন কতখানি জর্মন বলতে এবং বুঝতে পড়তে পারেন তার হদিস পেলুম না। কারণ বরোদায় আসে অতি অল্প জর্মন, তারাও আবার ইংরিজি শেখার জন্য তৎপর। তদুপরি তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে দেখা হলে এবং সে যদি জর্মন না জানে তবে তার অজানা ভাষায় কথা বলাটা বেয়া-দবিও বটে। এতাবৎ হয়তো তাই শ্রীযুত কাণের সামনে জর্মন বলার কোনো অনিবার্য পরিস্থিতি উপস্থিত হয় নি।

এর পরে আরো দু' বৎসর কেটে গেছে ঐ একই ভাবে। তবে ইতিমধ্যে আমার সর্বজ্ঞ বন্ধু পার্সী অধ্যাপক সোহরাব ওয়াডিয়া আমাকে বললেন, আপন অন্তরঙ্গ জাতভাইদের সঙ্গে নিভৃতে তিনি নাকি জিভটাতে লুব্রিকেটিং তেল ঢেলে

দেন এবং তখন তাঁর কথাবার্তা নাকি flows smoothly like oil, রসনার উপর অন্যত্র তাঁর সংযম অবিশ্বাস্য।

এই দু' বছর কাটার পর আমার হাতে ফোকটে কিঞ্চিৎ অর্থ জমে যায়। দয়াময় জানেন সেটা আমার দোষ নয়। সে যুগে বরোদায় খরচ করতে চাইলেও খরচ করার উপায় ছিল না। ওদিকে জর্মনিতে হিটলারের নাচন-কুদন দেখে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দ রইল না, তাঁর ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচ এবারে জর্মনির গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও গড়াবে। এবং সেটা আকছারই গড়ায় প্রতিবেশী ফ্রান্সের আঙিনায়। দুই দেশেই আমার বিস্তর বন্ধু। এইবেলা তাহলে তাদের শেষ দর্শনে যাই। ১৯১৮ সালে জর্মনরা আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে ও রণাঙ্গনে গ্যাসও চালায়। এবারে শুরুই হবে ওসব দিয়ে—অনেক দূরপাল্লার বোমারু এবং জঙ্গী বিমান নিয়ে, তীব্রতর বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে। ধুন্দুমার শেষ হলে আমার ক'জন বন্ধু যে আস্ত চামড়া নিয়ে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন।

১৯৩৮-এর গরমিকালে ভেনিস মিলান হয়ে বন্‌ শহরে পৌঁছলুম। জাহাজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাই নি। প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে যায় এক ফ্রেঞ্চ ইণ্ডোচায়নার তরুণীর সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী। 'অপূর্ব' বললুম ভেবেচিন্তেই। আমার নিজের বিশ্বাস—এবং আমার সে-বিশ্বাসে আমার এক বিশ্বপর্যটক বন্ধু সোৎসাহে সায় দেন—দোআঁসলা রমণীরা সৌন্দর্যে সব সময়ই খাঁটিকে হার মানায়। পার্টিশনের পরের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তার পূর্বে কলকাতার ইলিয়ট রোড, ম্যাকলাউড স্ট্রীটের যে অংশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরীদের হাট বসতো—খারাপ অর্থে নেবেন না—সে রকমটা আমি প্যারিস ভিয়েনা কোথাও দেখি নি।

কিন্তু এ তো গেল আর্যে আর্যে সংমিশ্রণ। কিন্তু ইণ্ডোচায়নায় ফ্রেঞ্চ আর্য রক্ত ও চীনা মঙ্গোলিয়ান রক্তে সংমিশ্রণ। এ জিনিস আমার কাছে 'অপূর্ব' বলে মনে হয়েছিল। শুধু আমার কাছে নয়, অন্য অনেকেরই কাছে। কিন্তু হলে কি হয়, পানির দেবতা বদর্‌ পীর আমার প্রতি বড্ডই মেহেরবাণী ধরেন—সপত্নদের কেউই একবর্ণ ফরাসী বলতে পারেন না। আমি যে অত্যুত্তম ফরাসী বলতে পারি তাও নয়। কিন্তু কথায় আছে, 'শয়তানও বিপদে পড়লে মাছি ধরে ধরে খায়।' তরুণী যাবেন কোথায়! জাহাজে অবশ্য দু-একটি পাঁড় টুরিস্ট ছিলেন যাঁরা ফরাসী জানেন, কিন্তু পাঁড় টুরিস্ট হতে সময় লাগে—বয়সটা ততদিন কিছু চুপ করে দাঁড়িয়ে যাত্রাগান দেখে না—পাঁড় টুরিস্ট হয় বুড়ো-হাবড়া। ওদিকে সুভাষিত আছে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গন অপেক্ষা তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

প্রবাদটা উল্টো দিক থেকেও আকছারই খাটে। আমার তখন তরুণ বয়স, তদুপরি আমি বাঙলা দেশের লোক—গায়ে বেশ কিছুটা চীনা-মঙ্গোল রক্ত আছে। তরুণীর সেটা ভারী পছন্দ হয়েছে—বলতেও কসুর করলেন না।

আমার তখন এমনই অবস্থা যে ওঁর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যেতে পারি। অবশ্য জানি, পৃথিবীটা গোল—আবার মোকামে ফিরে আসবো নিশ্চয়ই, এই যা ভরসা।

ভেনিস পৌঁছে জানা গেল, এ জাহাজ পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যায় না। ইনি শুধু মাকু মারেন ইতালি ও বোম্বাইয়ের মধ্যিখানে। আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল গভীর, কিন্তু ব্যাডমিণ্টনের শাটল কক্ হতে যতখানি প্রেমের প্রয়োজন ততখানি তখনো হয়ে ওঠে নি। আসলে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল সফরটা তেরো দিনের ছিল বলে। তেরো সংখ্যাটা অপয়া। বারো কিংবা চোদ্দ দিনের হলে হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। ভেনিস বন্দরে সজল নয়নে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমার যেসব সপত্নরা (আজকের দিনের ভাষায় পুংসতীন) ফরাসী জানতো না বলে বিফল মনোরথ হয়েছিল তাদের মুখে পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্য ফুটে উঠেছিল। বিদ্যেসাগর মশাই নাকি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে উল্লাস বোধ করতেন; জানি নে তিনি কখনো এমন হাসি দেখেছেন কি না যেটা দেখলে মানুষের মাথায় খুন চাপে।

ব্রেন্নার পাস, অস্ট্রিয়া হয়ে জর্মনিতে ঢুকলুম। বন্ শহরে পৌঁছলুম সন্ধ্যার সময়।

বন্ প্রাচীন দিনের গলি-ঘুঁচির শহর। একে আমি আপন হাতের উল্টো পিঠের চেয়েও ভাল করে চিনি। মালপত্র হোটেলে নামিয়ে বেরিয়ে পড়লুম প্রাচীন দিনের সন্ধানে।

ওই তো সামনে হান্‌সেন্ রেস্তোরাঁ। দেখি তো, আমার দোস্ত বুড়ো ওয়েটার হান্‌স্ এখনো টিঁকে আছে কি না। যেই না ঢোকা, হান্‌সের সঙ্গে প্রায় হেড্-অন্ কলিশন। বুড়ো হান্‌স্ বাজিকর। দু-হাতে সে একসঙ্গে পাঁচ প্লেট—দু-হাতে চার প্লেট, পঞ্চমটা এই চারটের মধ্যিখানে, উপরে—সুপ রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে তার চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে নিয়ে আসছিল। কোনোগতিকে সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিলে, 'ওই রে, আবার এসেছে সেই কালো শয়তানটা!' আমি বললুম, 'তোর জান নিতে।' 'হিটলার তোর জান নেবে—তুই ইহুদি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই লোকটার কথা ভাবলুম, যে দুঃখ করে বলেছিল, 'হায় মা, টাক তো দিলি, কিন্তু "ক"-এর সঙ্গে "আ"কারটা দিতে ভুলে গেলি।' আমি বললুম, 'ইহুদির কালো চুল দিলি, মা, কিন্তু তার পকেটের রেস্তটা দিতে

ভুলে গেলি।' হান্‌স্‌কে শুধালুম, 'তোমার ডিউটি কটা অবধি?' 'নটা।' 'তাহলে "কাইজার কার্লে" এসো নটায়।' 'কেন? আমেরিকায় পয়সাওলা কাকা মারা গেছে নাকি?' 'না, কোলারে।' 'সে আবার কোথায়?' 'ভারতবর্ষে সোনার খনি।' 'ওঃ! তাহলে একটা গোল্ড-ডিগার সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

'গোল্ড-ডিগার' মানে যে-সব খাবসুরৎ মেয়ে প্রেমের অভিনয় করে আপনার মনি-ব্যাগটি ফাঁকা করতে সাহায্য করে। আপনারই উপকারার্থে। পোকা লাগার ভয়ে সেটাতে বাতাস খেলাতে চায়।

গোরস্তানে ঢুকলে আমরা চেনা লোকের গোরের সন্ধান করি; অচেনা লাইব্রেরিতে ঢুকলে চেনা লেখকের বই আছে কিনা তারই সন্ধান করি প্রথম। বন্‌ শহর নূতনত্ব অত্যন্ত অপছন্দ করে; তৎসত্ত্বেও দু-চারটে নূতন রেস্তোরাঁ কাফে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো তদারক করার কণামাত্র কৌতূহল অনুভব করলুম না। কে বলে মানুষ নূতনত্ব চায়?

কুকুর যে রকম পথ হারিয়ে ফেললে আপন গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাড়ি ফেরে, আমিও ঠিক তেমনি সাত দিন ধরে আজ ভেনুসবের্গ, কাল গোডেসবের্গ, পরশু জীবেনগেবের্গে, পরের দিন রাইনে লঞ্চ-বিহার করে করে আপন প্রাচীন দিনের গন্ধ খুজে খুঁজে কাটালুম; আর শহরের ভিতরকার গলি-ঘুঁচির রেস্তোরাঁ-বারের তো কথাই নেই।

অষ্টম দিনে ড্যুসলডর্ফে আমার প্রাচীন দিনের সতীর্থ পাউলকে ট্রাঙ্ক করলুম। প্রথমটায় সে একচোট গালাগালি দিলে আমি কেন আগে জানাই নি। আমি বললুম, 'কেন? বেতার তো আমার টুরের খবর প্রতিদিন বুলেটিনে ঝাড়ছে।'

শুধালে, 'কোন্‌ বেতার? দক্ষিণ মেরুর?'

'না, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্পের।'

'এই! চুপ চুপ!'

'না রে না, ভয় পাস নি। তোদের ফ্যুরারের সঙ্গে আমাদের এখন খুব দোস্তী। তিনি গোপনে আমাদের দু-একজন বেসরকারী নেতাকে শুধিয়েছেন, তিনি যদি ব্রিটন আক্রমণ করেন তবে ভারতীয়েরা তার মোকা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কি না।'

'থাক্‌ থাক্‌। আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

আমি বললুম, 'হাইল হিটলার।'

রিসীভার রাখার এক মিনিট যেতে না যেতে টেলিফোন বাজলো। রিসীভার তুললুম। অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ এল বামাকণ্ঠে, 'আমি কি ডক্টর সায়েডের

সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'কথা বলছি।'

'আমি ট্রাঙ্ককল দফতর থেকে কথা বলছি। খানিকক্ষণ আগে আপনি ড্যুসলডর্ফে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন না ?'

সর্বনাশ! পাউলের ভয় তাহলে অমূলক নয়। নিশ্চয়ই নাৎসি স্পাই। আমাদের কথাবার্তা ট্যাপ করেছে। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আপনি ইণ্ডিয়ান ?'

'কি করে—'

'না, না, মাফ করবেন—আপনার জর্মন উচ্চারণ খুবই খাঁটি, কিন্তু কি জানেন, আমি ট্রাঙ্ক কল একস্‌চেঞ্জে কাজ করি বলে নানান দেশের নানান ভাষা নানান উচ্চারণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শুধু কণ্ঠস্বর নিয়ে সব-কিছু বুঝতে হয় বলে অল্প দিনের ভিতরেই এ জিনিসটা আমাদের আয়ত্ত হয়ে যায়।'

আশ্চর্য নয়। মানুষ তার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভাষা বলার সময় আপন অজানতে প্রকাশ করে ফেলে আর ওকীবহাল ব্যক্তি সেটা ধরে ফেলতে পারেন। শুনেছি লণ্ডনের কোন্ এক আর্ট একাডেমির অধ্যক্ষ যে কোনো ছবি দেখেই বলে দিতে পারতেন, কোন্ দেশের লোক এটা এঁকেছে। একই মডেল দেখে দেড়শটি ছেলে স্কেচ করেছে; তিনি দিব্য বলতে পারতেন, কোনটা ইংরেজের, কোনটা চীনার, আর কোনটা ভারতীয়ের। এবং যদিও মডেলের মেয়েটি ইংরেজ তবু সব চাইতে ভাল এঁকেছে ইণ্ডিয়ান। মনকে এরই স্মরণে সান্ত্বনা দিলুম, তবে বোধ হয় আমার জর্মন উচ্চারণ জর্মনদের চেয়েও ভাল!

অনেক ইতিউতি করে নারীকণ্ঠ বললে, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বার বার ক্ষমা চাইছি, আমি কি পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার দর্শন পেতে পারি? আমার একটু দরকার আছে। সেটা কিন্তু জরুরী নয়; আপনার যেদিন যখন সুবিধে হয়।'

তাড়াতাড়ি বললুম, 'পাঁচ মিনিট কেন—পাঁচ ঘণ্টা নিন। আমি এখানে ছুটিতে। দিন ক্ষণ আপনিই ঠিক করুন।'

'কাল হবে? আমার ডিউটি বিকেল পাঁচটা অবধি। আপনার হোটেলের পাশেই তো কাফে "হুফ্‌শ্লাগ্"। সেখানে সাড়ে পাঁচটায়? আমি আপনাকে ঠিক চিনে নেব। বন্ শহরে আপনিই হয়তো একমাত্র ইণ্ডিয়ান।'

পরদিন কাফের মুখেই একটি মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, 'গুট্‌নট্‌াখ্! হের সায়েড্!'

আমি বললুম, 'গুটেন্‌টাখ্‌, ফ্রলাইন—'

এস্থলে প্রথম পরিচয়ে আপন নাম বলা হয়। ফ্রলাইন (কুমারী, মিস্‌) কি একটা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। কিন্তু নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে এস্থলে দু'বার প্রশ্ন করা—বিশেষ করে মহিলাকে—আদব-দুরস্ত নয়।

দেহের গঠনটি ভারী সুন্দর, আঁটসাঁট, দোহারা। প্রলম্বিত বাহু দুখানি এমনি সুডৌল যে, মনে হয় যেন দু গুচ্ছ রজনীগন্ধা। রাস্তার উজ্জ্বল আলোতে দেখছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম কনুইয়ের কাছে মণি-খনির মত দুটি টোল। গোটা দেহটি যেন রসে রসে ভরা। শুধু দেহটি দেখলে যে কেউ বলবে, মধুভরা পূর্ণ যুবতী।

কিন্তু মুখটির দিকে তাকানো মাত্র যে-কোনো মানুষের মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলে যাবে। ব্লাউজের গলার বোতাম থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত—মনে হল এ যেন অন্য বয়সের ভিন্ন নারী। মুখের চামড়ায় এক কণা লাবণ্য এক কাঁচ্চা মসৃণতার তেল নেই। গলার চামড়া পর্যন্ত বেশ-কিছুটা ঝুলে পড়েছে। সিকি পরিমাণ চুলে পাক ধরেছে। আর চোখ দুটি—সেগুলোর যেন দর্শনশক্তিও হারিয়ে গিয়েছে—জ্যোতিহীন, প্রাণহীন। এর বয়েস কত হবে?—শুধু যদি মুখ থেকেই বিচার করতে হয়? আর সে কী বিষণ্ণ মুখ! বয়স বিচারের সময় সেই বিষণ্ণতাই তো হবে প্রধান সাক্ষী—জ্যোতিভ্রষ্ট চক্ষুতারকার চেয়েও কণ্ঠদেশের লোলচর্মের চেয়েও।

ইতিমধ্যে আমরা কাফেতে ঢুকে আসন নিয়েছি। মহিলাটি—না যুবতীটি, কি বলবো? (সেই যে কালিদাসের গল্পে বুড়ো স্বামীর ধড়ের সঙ্গে জোয়ান ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু জুড়ে দিয়েছিল এক নারী)—ইতিমধ্যে দাস্তানা খুলে নিয়েছেন। মুখের সঙ্গে মিলিয়ে বেরলো হাত দুখানা—রসে ফাটো-ফাটো দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নয়—নির্জীব, কোঁকড়ানো চামড়া; ইংরিজিতে বলে ক্রোজ ফীট, কাকের পা। অতি কষ্টে নিজেকে সামলেছিলুম।

বললেন, 'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি।' অর্থাৎ তিনি বিল শোধ করবেন। অন্য সময় হলে এ বারতা আমার কর্ণকুহরে নন্দন-কাননের স্বর্ণোজ্জ্বল মধুসিঞ্চন করতো। কিন্তু এই বিষণ্ণ মুখের সামনে আমার গলা দিয়ে যে কিছুই নামবে না। বললুম, 'আমি যখন এখানে পড়তুম—'

বাধা দিয়ে শুধোলেন, 'আপনিও পড়েছেন নাকি?'

এই 'ও'টার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'তখন তো কোনো অবিবাহিত রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল না।'

তাঁর কণ্ঠটি ছিল এমনিতেই ক্ষীণ—এখন শোনালো মুমূর্ষুপ্রায়। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ব্যত্যয় সব সময়ই দুটো একটা থাকে। কিন্তু দয়া করে আপনি এসব গায়ে মাখবেন না। আমি আপনার অপ্রিয় কোনো কাজ করতে চাই নে।'

কাফেতে এ সময়ে জর্মনদের ইয়া ইয়া লাশ ভামিনীদের ভিড়। ওয়েট্রেস এক কোণে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে দিল। বুঝলুম, মহিলাটি পূর্বাহ্নেই টেবিলটি রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনি কি খেতে ভালবাসেন? চা নিশ্চয়ই। কিন্তু এদেশে যে চা বিক্রী হয় সে তো অখাদ্য। তবে আমার কাছে ভাল চা আছে। আমি লণ্ডন থেকে সেটা আনাই।' ব্যাগ থেকে বের করে একটি ছোট্ট পুলিন্দা তিনি ওয়েট্রেসের হাতে তুলে দিলেন। সে কিছু বললো না বলে বুঝলুম, এ ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত।

আমাদের অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও ভাল ভাল কেক, স্যান্ড্উইজ্, টার্ট উপস্থিত হল। বুঝলুম, এগুলো পূর্বের থেকেই অর্ডার দেওয়া ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশের খুব বেশী ছাত্র জর্মনিতে পড়তে আসে না—কি বলেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্পই। তাও বেশীর ভাগ শিখতে আসে সায়ান্স আর টেকনিকাল বিদ্যা।'

একটু হেসে বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিউম্যানিটিজের। আর বন্ তো তারই জন্য বিখ্যাত। তবে এখানে এসেছেন অল্প ভারতীয়ই। আপনারা যাঁরা এসেছিলেন, ভারতে তাঁদের কোনো সঙ্ঘ আছে কি, যার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন?'

আমি বললুম, 'না। এমন কি আমি এঁদের মাত্র দু-একজনকে চিনি। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—' বলে আমি চায়ে চুমুক দিলুম। তিনি বললেন, 'ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা, কুলু থেকে কন্যাকুমারী।' আমি তো অবাক! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অত ডীটেল জানলেন কোথা থেকে? এখানকার শিক্ষিত লোককে পর্যন্ত ইণ্ডার (ভারতীয়) আর ইণ্ডিয়ানার (রেড ইণ্ডিয়ান) এ দুয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে বলতে হয়।'

'এবং তার পরও কেউ কেউ আপনাকে শুধোয়, আপনি ৎসেন্টাল আফ্রিকানার (সেণ্ট্রাল আফ্রিকান) না জ্যুড্ ইটালিয়েনার (সাউৎ ইটালিয়ান)?'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অতশত জানলেন কি করে ?'

'পরে বলবো। কিন্তু আপনি ভারতে বন্-এর ছাত্রদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন ?'

'ভারতের বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশ থাকেন কলকাতায়। সেখানে থাকলেও খানিকটা যোগসূত্র থাকে। আমি থাকি ছোট্ট বরোদায়—'

অস্ফুট শব্দ শুনে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। দেখি, তাঁর পাংশু মুখে যে দু-ফোঁটা রক্ত ছিল তাও অন্তর্ধান করেছে। ভয় পেয়ে শুধালুম, 'কি হল আপনার ?'

ঢোঁক গিলে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'ও কিছু না। আমি অনিদ্রায় ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখানে বড্ড লোকের ভিড়। সব বন্ধ। আমি আমার অফিস-ঘরের জানলা শীত গ্রীষ্ম সব সময় খোলা রাখি।'

আমি বললুম, 'তা হলে খোলায় চলুন।' তারপর শুধালুম, 'আপনার সহকর্মী অন্য মেয়েরা কিছু বলে না ?'

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেন নি। পরে বললেন, 'ও। আমি এককালে টেলিফোন গার্লই ছিলুম। এখন তারই বড় অফিসে কাজ করি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ। কিন্তু আগেরটাই ছিল ভালো।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারবেন না। তার চেয়ে চলুন, ওই যে প্রাচীন যুগের একখানা ঘোড়ার গাড়ি এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই চড়ে রাইনের পাড়ে গিয়ে বসি।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আস্তে আস্তে শুধোলেন, 'গেলট্নার যে ঋগ্বেদের জর্মন অনুবাদ করেন সেইটের উপর নির্ভর করে যে একটি ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ থেকে বেরোবার কথা ছিল, তার কি হল ?'

আমি এবারে সত্যই অবাক হলুম। গেলট্নারের অনুবাদ অনবদ্য। গত একশ বছরে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইয়োরোপ তথা ভারতে যত গবেষণা হয়েছে গেলট্নারের কাছে তার একটিও অজানা ছিল না, এবং অনুবাদ করার সময় যেখানে যেটির দরকার হয়েছে সেখানে সেইটে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ মহিলাটি যে অতিশয় সমীচীন ও সময়োপযোগী প্রস্তাবটির কথা বললেন সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না। বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম, 'কিন্তু আপনি এ সবের খবর পেলেন কোথায় ?'

তিনি চুপ করে রইলেন। গাড়ি মন্থর গতিতে বেটোফেনের প্রতিমূর্তির

পাশ দিয়ে, ম্যান্‌স্টার গির্জে পেরিয়ে, য়ুনিভার্সিটি হয়ে রাইনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখি, মহিলার মুখ তখনো ফ্যাকাশে। প্রস্তাব করলুম, 'ওই কাফেটার খোলা বারান্দায় গিয়ে বসি, আর আপনি কিছু একটা কড়া খান।' ওয়েটারকে বললুম কন্যাক্ নিয়ে আসতে।

দুই ঢোঁক কন্যাক্ খেয়ে যেন বল পেলেন। বললেন, 'আমি এখনো অবসরমত কিছু কিছু ইওলজির চর্চা করি। বছর বারো পূর্বে যখন আরম্ভ করি তখন পূর্ণোদ্যমেই করেছিলুম।'

তারপর আবার অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন। রাইনের জলের উপর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দু-একখানা মোটর বোট আসা-যাওয়া করছে মাত্র। বাতাস নিস্তব্ধ। এমনিতেই রাইনের সন্ধ্যা আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে, আজ যেন রাইনের জলে চোখের জল ছলছল করছে।

মহিলাটি বললেন, 'কাল থেকে ভাবছি, কি করে কথাটি পাড়ি।'

যে কোনো কারণেই হোক মহিলাটি যে বেদনাতুর হয়ে আছেন সে-কথা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বললুম, 'আপনি দয়া করে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমাদ্বারা যদি কোন-কিছু করা সম্ভব হয়, কিংবা সুদ্ধমাত্র আমাকে কিছু বলতে পেরে আপনার মন হালকা হয়—'

মানুষকে ক্রমাগত সান্ত্বনার বাক্য দিয়ে প্রত্যয় দিতে থাকলেই যে সে মনস্থির করতে পারে তা নয়; বরঞ্চ কথা বন্ধ করে দিলে সে আপন মনে ভাববার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগ পায়। আমি বন্-বয়েল শহরের মাঝখানে রাইনের উপরের পাথরের মোটা মোটা থামের তুলে-ধরা বিস্তীর্ণ স্পানওলা সুন্দর সেতুটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। লোহার পুল কেমন যেন নদীর সঙ্গে খাপ খায় না—পাথর যেন জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, উভয়েরই রঙ এক।

দুনিয়াতে হেন তালা আবিষ্কৃত হয় নি যেটা কলেকৌশলে, কখনো বা পশুবল প্রয়োগ করে, কখনো বা মোলায়েম আদরসোহাগ করে খোলা যায় না; ওদিকে আবার গেস্তাপো, ওগপু এ সব-কটা পদ্ধতি এবং আরো মেলা নয়া নয়া কৌশল খাটিয়েও বহু মানুষের মনের তালা খুলতে পারে নি। এবং হঠাৎ অকারণে কেন যে সেটা খুলে যায় তার হদিস কন্‌ফেশনের পাদ্রীসায়েব থেকে আরম্ভ করে আমাদের যৌবনকালের টেগার্ট পাষণ্ডও সন্ধান পায় নি।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর দেখলেন নলরাজ নেই; তারপর তাঁর ইহজীবনে যদি নলের সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ না হত

তবে তিনি নল সম্বন্ধে বা আপন অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি ভাবতেন ?

নলোপাখ্যানের উল্লেখে আমি আশ্চর্য হলুম না! যে রমণী গেলটনারের বেদানুবাদের সঙ্গে সুপরিচিতা, নলরাজ তো তাঁর নিত্যালাপী আত্মীয়!

আমি একটু ভেবে বললুম, 'রসরাজও তো বৃন্দাবনে শ্রীমতীর কাছে ফিরে যান নি। তবু তো তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যয় ত্যাগ করেন নি। মহাত্মা উদ্ধব যখন বৃন্দাবন দর্শন করে মথুরা ফিরে এলেন তখন রসরাজ সব শুনে বলেছিলেন, "বিরহাগ্নি যদি তাঁর এতই প্রবল হয় তবে তিনি জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যান নি কেন ?" কী বেদরদী প্রশ্ন! কিন্তু শ্রীরাধা সেটা জানতেন বলে উদ্ধবকে বলতে বলে দিয়েছিলেন, তার অবিরাম অশ্রুধারা সেই অগ্নি বার বার নির্বাপিত করছে —"তনু জরি জাত জো ন অসুঁয়া ঢরত্ উধো"—যদুপতি শেষ প্রশ্ন শুধান, "আমার বিরহে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় নি কেন ?" এর উত্তরও উদ্ধব শিখে নিয়েছিলেন, "আপনি একদিন না একদিন বৃন্দাবনে ফিরবেন এই প্রত্যয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"'

দময়ন্তী নিশ্চয়ই প্রত্যয় ছাড়েন নি।

মহিলা বললেন, 'তুলনাটা কি ঠিক হলো ? শ্রীরাধা তো মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পেতেন, তিনি কংস বধ করেছেন, তিনি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ দৌত্য করেছেন, জনসমাজের বৃহত্তর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন—এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেতেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এবং রুক্মিণীকে—সে কুমারী আবার শিশুপালের বাগ্‌দত্তা বধূ—বিয়ে করেছেন, তার পর সত্যভামাকে, সর্বশেষে ভাল্লুকী—'

আমি নিজের থেকে থেমে গেলে পর মহিলাটি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ আপনিই তুলেছিলেন ; আমি তুলি নি।'

আমি বললুম, 'আপনি দময়ন্তীর কথা তুলেছিলেন—ভগবান করুন, আপনার নল যেন—'

তিনি মাথা নাড়তে আমি চুপ করে গেলুম।

বললেন, 'আপনি গোডেসবের্গ চেনেন ?'

আমি বললুম, 'বা রে, সেখানে তো আমি এক বছর বাস করেছি।'

'প্রফেসর কির্ফেল সেখানে বাস করতেন ; আমরা ছিলুম তাঁর প্রতিবেশী। আমি প্রতিদিন বন্ শহরে আসতুম চাকরি করতে। হঠাৎ একদিন দেখি তার পরের স্টপেজ হোখ্-ক্রয়েৎসে একজন বিদেশী উঠলেন। মুখখানা বিষণ্ণ। সেদিন আর কিছু লক্ষ্য করি নি। কাইজার প্লাৎসের স্টপেজে উনিও নামলেন। আমি

বইয়ের দোকান য়্যোর্‌শাইটে কাজ করতুম। আপন অজান্তেই লক্ষ্য করলুম বিদেশী য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকলেন।

তিন-চার মাস প্রায় রোজই একই ট্রামে যেতুম, ভদ্রলোকের প্রতি আমার কোনো কৌতূহল ছিল না কিন্তু লক্ষ্য করলুম, বিদেশীর বিষণ্ণ ভাব আর কাটলো না।

তারপর একদিন তিনি আমাদের দোকানে এসে ঢুকলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। ভাবলুম এ আবার কোন্ দেশের লোক? এত লাজুক কেন?

ভাঙা ভাঙা জর্মন ভাষায় এক জর্মন ইণ্ডলজিস্টের বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ চাইলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলুম: জর্মনিতে বসে জর্মনের লেখা বই পড়লেই হয়। বললুম, "এটা লণ্ডন থেকে আনাতে হবে।" তারপর কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, "মূল জর্মনটা পড়লেই তো ভাল হয়।"

তিনি বললেন, "আমার আছে, কিন্তু বুঝতে বড় অসুবিধা হয়।" সঙ্গে সঙ্গে বইখানা পোর্টফোলিয়ো থেকে বের করে কাউণ্টারের উপর রাখলেন।

আমি তখনো ইণ্ডলজির কিছুই জানতুম না—নামটাম টুকে নিয়ে তাঁকে দু-চারখানা ভাল অভিধান, সরল জর্মন বই, ব্যাকরণ দেখালুম। আমি ইংরিজি জানতুম বলে তাঁর ঠিক কোন্ কোন্‌টা কাজে লাগবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত সৎপরামর্শ দিলুম। আমি যেটা দেখাই সেটাই তিনি কিনে ফেলেন। শেষটায় আমিই হেসে বললুম, "এগুলো শেষ করুন। এর পরের ধাপের বই আমি বেছে রাখবো।" টাকা দিয়ে বইগুলো নিয়ে যখন চলে গেছেন তখন দেখি তাঁর ইণ্ডলজির বইখানা কাউণ্টারে ফেলে গেছেন। তা যান, কাল ট্রামে দিয়ে দিলেই হবে।

ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এই আমার প্রথম পাঠ। এবং এখনো সে বইখানা মাঝে মাঝে পড়ি। ভিণ্টারনিৎসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। এ বই দিয়ে আরম্ভ না করলে হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার কৌতূহল অঙ্কুরেই মারা যেত।

ভিণ্টারনিৎস লেখেন অতি সরল জর্মন; তাই আশ্চর্য হলুম যে বইয়ের মালিক এতদিনেও এতখানি জর্মন শিখে উঠতে পারেন নি কেন?

আমি চেপে গেলুম যে, ঠিক এই বইখানাই ভিণ্টারনিৎস শান্তিনিকেতনে আমাদের পড়িয়েছিলেন।

আর পাঁচজন জর্মনের তুলনায় বিদেশীদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কম। বইয়ের দোকানে কাজ করলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জাত-বেজাতের বই পড়া হয়ে যায়।

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল—অনেকখানি—ওই করে।

কিন্তু এই লোকটির প্রতি কেমন যেন আমার একটু দয়া হল। তবু এটা ঠিক, আমি নিশ্চয়ই গায়ে পড়ে তাঁকে সাহায্য করতে যেতুম না। তবে এ-কথাও ঠিক, ভিণ্টারনিৎসের বেদ অনুচ্ছেদে উষস্ আবাহন এবং জুয়াড়ির মনস্তাপ দুটোই আমার কল্পনাকে এক অপূর্ব উত্তেজনায় আলোড়িত করেছিল। উষামন্ত্র লিরিক, রহস্যময়, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল যে, ওই একই সময়ে অতিশয় নিদারুণ বাস্তব জুয়োখেলা ও জুয়াড়িজীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা একই সঞ্চয়নে স্থান পেয়েছে। আমার বাবা ছিলেন গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। ইস্কুলে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে যা গ্রীক শেখে সেটা ম্যাট্রিক পাশের পরই ভুলে যায়। আমার পিতা সেটা হতে দেন নি। এখন আমার ইচ্ছে হল সংস্কৃত শেখার। তাই তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করলুম। আমি তাঁর জন্য ভিণ্টারনিৎসের জর্মন থেকে ইংরিজি অনুবাদ করে দিতুম, আর তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন।'

আমার মনে সর্বক্ষণ নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল, কিন্তু মহিলাকে বাধা দিলুম না।

ততক্ষণে কাফেতে উল্লাস, হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। জর্মন জনগণের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। ঘড়ি ঘড়ি খবর আসছে, নাৎসি বিজয়-সেনানী কি ভাবে অস্ট্রিয়ার শহরের পর শহর দখল করে যাচ্ছে, তারা কি ভাবে সর্বত্র উদ্বাহু অভিনন্দিত হচ্ছে।

আমি একটু মুচকি হেসে বললুম, 'ভালুকও মানুষকে আলিঙ্গন করে শুনেছি, কিন্তু সে আলিঙ্গন—যাক্ গে।'

মহিলাটি একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'এসব মন্তব্য আপনি সাবধানে করবেন। কি করে জানলেন, আমি নাৎসি নই?'

আমি হেসে বললুম, 'জলবত্তরলম্—আপনি তো সংস্কৃত জানেন। তার মানে যে-জন বেদ পড়েছে, সে-ই জানে বেদের আর্যধর্মের সঙ্গে নাৎসিদের এই "আর্যামি"র বড়ফাট্টাইয়ের সূচ্যগ্র পরিমাণ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আপনি চিত্তবিক্ষেপ হতে দেবেন না। তার পরের কথা বলুন।'

একটু চিন্তা করে বললেন, 'প্রথমে সাহচর্য, তারপর বন্ধুত্ব, সর্বশেষে প্রণয় হল আমাদের দুজনাতে।'

এবারে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তিন বছরের প্রণয়—তারপর দশ বছর ধরে আমি তাঁর কোনো খবর পাই নি। এই দশ বছর আমার একা একা

কেটেছে। এই দীর্ঘ তেরো বছরের কথা আপনাকে বলতে গেলে ক'মাস ক' বছর লাগবার কথা তার সামান্যতম অনুমান আমার নেই।

এই শেষের দশ বৎসর কি করে কেটেছে, এখন কি করে কাটছে সেটা বোঝাবার চেষ্টাও আমি করবো না। আর সেটা শোনাবার জন্যও আমি আপনার দর্শন কামনা করি নি। এই যে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পেরিয়ে এলুম, এখানে পড়বার সময় ঠিক একশ বছর আগে, আমাদের সবচেয়ে সেরা লিরিক কবি হাইনে একটি চার লাইনের কবিতা লেখেন :

"প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না বেদনা ;
তবু তো কোনো মতে সয়েছিনু
কি ক'রে যে সে-কথা শুধিয়ো না।"

তীব্র বেদনার তীক্ষ্ণ প্রকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন হাইনে বার বার, কিন্তু হার মেনে উপরের চতুষ্পদীটি রচেন। একশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী সেগুলো পড়ছে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমাদের পোয়েট টেগোর তাঁর প্রথম যৌবনে এক জর্মন মহিলার কাছ থেকে অল্প জর্মন শেখার পরই তাঁর গুটিদশেক কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। আপনি যেটি বললেন সেই চতুষ্পদীটিও তাতে আছে।'

'প্রথম যৌবনে তিনি কি শোক পেয়েছিলেন ?'

'তাঁর প্রাণাধিকা ভ্রাতৃবধূ আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সে-কথা আরেকদিন হবে। আমি নিজে কাপুরুষতম এসকেপিস্ট ; তাই দুঃখের কথা এড়িয়ে চলি। তার চেয়ে আপনাদের সেই তিন বছরের আনন্দের কথা বলুন।'

'প্রথম বছর কেটেছে স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যেমন চেনা-অচেনায় মিশে যায়, হঠাৎ চেনা জিনিস, চেনা মানুষ মনে হয় অচেনা, আবার অচেনা জন চেনা, এ যেন তাই। তাঁকে যখন মনে হয়েছে এঁর সব কিছু আমার চেনা হয়ে গিয়েছে তখন হঠাৎ মনে হয়েছে যেন ইনি আমার সম্পূর্ণ অজানা জন। আবার কেমন যেন এক প্রহেলিকার সামনে অন্ধকারে ব্যাকুল হয়ে হাতড়াচ্ছি—মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুমন্ত হাত পড়ল আমার গায়ের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আমার চৈতন্যে তখন বিশ্বব্যাপী মাত্র একটি অনুভূতি—এই লোকটির মাঝেই আমার অস্তিত্ব, আমার অন্য কোনো সত্তা নেই। গোডেসবের্গের পিছনে নির্জনে গভীর পাইন বনে সকাল থেকে পরের দিন ভোর

অবধি কাটিয়েছি একটানা, রাইনের ওপারে বরফ ভেঙে ভেঙে উঠেছি মার্‌গারেটেন হোহ অবধি, ফ্যান্‌সি বলে শ্যাম্পেনের পর শ্যাম্পেন খেয়ে আমি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছি ডান্‌স-হলের সামনের ঘাসের উপর—তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বাড়িতে।'

কেন জানি নে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলুম, 'উনি কখনো বে-এক্‌তেয়ার হতেন না?'

বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি যে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন! না, কক্‌খনো না। এখানকার পাঁড়দের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তাঁকে খেতে দেখেছি বহুবার, চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়তো না। অথচ তিনি একাধিক বার আমাকে বলেছেন, তাঁর জানা মতে তাঁর সাত পুরুষের কেউ কখনো মদ খায় নি।

কিন্তু প্রথম বছরের চেয়েও—অন্ততঃ আমার পক্ষে—মধুরতর আর গৌরবময় শেষের দুই বছর।

এক বৎসর ক্লাস আর সেমিনার করার পর অধ্যাপকের আদেশে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ডক্টরেট থীসিসের প্রথম খসড়া—অবশ্য ইংরিজিতে। মোটামুটি তিনি কি লিখবেন সে সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।'

থেমে গিয়ে তিনি অত্যন্ত করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ছি ছি। আপনি আমাকে এখনো চিনলেন না!'

'চিনেছি বলেই চাইছি। এখন যা বলব, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, কাউকে বলবেন না।'

আমি তাঁর হাতে—সেই শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাতে চাপ দিলুম।

'প্রথম পরিচ্ছেদের কাঁচা খসড়া পড়ে আমি অবাক। একেবারে কিছুই হয় নি বললে অত্যুক্তি হয়, কিন্তু এতে যে কোনো বাঁধই নেই, বক্তব্য কোন্‌ দিকে যাচ্ছে তার কোনো নির্দেশ নেই—আছে গাদা গাদা ফ্যাক্‌ট্‌স্‌, এবং তার মধ্যেও কোনো সিস্‌টেম্‌ নেই।

কারণ ইতিমধ্যে আমি যে খুব বেশী সংস্কৃত শিখেছি তা নয়, তবে আপনি তো জানেন, জর্মন, ফরাসী এবং ইংরেজী, মাত্র এই তিনটি ভাষাতেই ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়ে গিয়েছে যে সেগুলো মন দিয়ে বার বার পড়লে, নোট টুকে মুখস্থ করলে কার সাধ্য বলে আপনি সংস্কৃত জানেন না! যেদিন তিনি আমায় প্রথম তাঁর থীসিসের সাবজেক্ট—'গুপ্তযুগের কালচারাল লাইফ'—বলেন সেদিন থেকেই আমি ঐ বিষয়ের উপর যা পাওয়া যায় তাই পড়তে আরম্ভ

করেছি, নোট টুকেছি, মুখস্থ না করেও যতখানি সম্ভব মনে রাখবার চেষ্টা করেছি। আর সংস্কৃত তো সঙ্গে সঙ্গে চলছেই। আপনি তো আমাদের সিস্টেম জানেন। তাই তিন মাস যেতে না যেতেই আমি র‍্যাপিড্ রীডিং সিস্টেমে খানিকটা বুঝে কিছুটা না বুঝে কালিদাসের সব লেখা—এমন কি কালিদাসের নামে প্রচলিত অন্য জিনিসও পড়ে ফেলেছি। তবে আমার ব্যাকরণ জ্ঞান এখনো কাঁচা, যদিও গ্রীকের সাহায্যে শব্দতত্ত্বে আমার কিছুটা দখল আছে।

ওঁর ইংরিজিটা যে আমি জর্মনে অনুবাদ করবো সেটা তো ধরেই নেওয়া হয়েছিল। তারই অছিলা নিয়ে আমি সমস্তটা ঢেলে সেজে লিখলুম। পাছে তাঁর আত্মসম্মানে লাগে তাই বললুম, "তুমি এ-কাঠামোর উপর আরো ফ্যাক্টের কাদামাটি চাপাও, রঙ বোলাও।"

ইতিমধ্যে আমার বইয়ের দোকান আমাকে পাঠালো লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজে—আমাদের বইয়ের বাজার প্রসার করতে। তিনিও তাঁর প্রফেসরের কাছ থেকে ছুটি নিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে মাল-মশলার সন্ধানে যাবার জন্য।

সে সুযোগের অবহেলা আমি না করে আমাদের প্রকাশিত আর বিরল আউট অব প্রিন্ট কিছু কিছু বই নিয়ে দেখা করতে গেলুম লণ্ডন স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের ইণ্ডলজি-অধ্যাপকদের সঙ্গে। তাঁরা আমায় ভারি খাতির করলেন, কেউ কেউ চায়ে ডিনারে নিমন্ত্রণও করলেন। আমি ঘুরে ফিরে শুধু গুপ্ত যুগের কালচারাল লাইফের দিকে কথার মোড় ফেরাই। ওঁরা অকৃপণ হৃদয়ে আপন আপন গবেষণার ফল বলে যেতে লাগলেন। একদিন এক অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে ছিলেন আরো দুজন ইণ্ডলজির অধ্যাপক। আমি গুপ্ত যুগ টুইয়ে দিতেই লেগে গেল তিন পণ্ডিতে লড়াই। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই পরিষ্কার হয়ে গেল তিন জনার তিন থীসিস। একজন বললেন: গুপ্ত কেন, তার পরবর্তী যুগেরও সর্ব নাট্যের কাঠামো গ্রীক নাট্য থেকে নেওয়া। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য: গুপ্ত যুগের চোদ্দ আনা কৃষ্টির মূলে দ্রাবিড়। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের চোরাবালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে গুপ্ত যুগে এসে নির্মল তৃষাহরা হ্রদে পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় জনের মতে গুপ্ত যুগের বেশীর ভাগ পরবর্তী যুগের—গুপ্ত যুগের নামে পাচার হচ্ছে। যে রকম ওমর খৈয়ামের দু'শ বছর পরে রচনা বিস্তর চতুষ্পদী তাঁর সঙ্কলনে ঢুকে গেছে।

ভোরের প্রথম বাস্ ধরে আমরা যে যার বাসায় ফিরেছিলুম।

তার পূর্বে আমি সবিনয়ে শুধিয়েছিলুম, আমি তাঁদের বক্তব্যের কিছু কিছু

ব্যবহার করতে পারি কি না। তিনজন একবাক্যে বলেছিলেন, "আলবৎ, নিশ্চয়, অতি অবশ্যই। এসব তো কমন নলেজ। তাই দয়া করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না। আমাদের বদনাম হবে যে আমরা কমন নলেজ গবেষণা বলে পাচার করি।" একেই বলে প্রকৃত বিনয়।

বাসে বাসেই আমি যতখানি স্মরণে আনতে পারি শর্টহ্যাণ্ড টুকতে আরম্ভ করি। বাড়ি ফিরে বিছানা না নিয়ে যখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বন্ধু বিছানায় বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বেড্-টীর জন্য ঘণ্টা বাজালেন।

অক্স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজেও অধ্যাপকদের সাহায্য পেলুম।

তারপর বনে ফিরে এসে সেই সব বস্তু গুছিয়ে, খসড়া বানিয়ে ফেয়ার কপি টাইপ করে, তাঁর প্রোফেসরের মেরামতির পর সে অনুযায়ী আবার টাইপ করে পরিপূর্ণ থীসিস তৈরী হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ—'

তিনি ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'না, না, না। আপনি ভুল ইনফারেন্‌স্ করছেন। সংস্কৃত ভাষাটি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হেন ব্যাকরণ নেই যার প্রত্যেকটি সূত্র, নিপাতন, আর্ষপ্রয়োগ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল না। কঠিন কঠিন টেক্‌স্‌ট্ দুবার না পড়েই তিনি অর্থ বের করে দিতে পারতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিনি তাঁর অধ্যাপককে এই দুরূহ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তাঁর থীসিসে যে অসংখ্য বস্তু মূল সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে তার অনুবাদে তো কোনো ভুল পাবেনই না, আর সেগুলোই করেছে তাঁর বইখানাকে রিচ ইন্ টেকস্‌চার—সমৃদ্ধশালী। তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা মেনে নিচ্ছি।'

রমণীটি বড়ই সরলা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। এসব কথা আমি এ জীবনে কাউকে বলি নি। এবং আরেকটা কথা, ওঁকে তো ভাইভাও দিতে হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।' ভাইভাতে কোন্ ক্লাস, আর রিটনে (অর্থাৎ) থীসিসে কোন্ ক্লাস পেয়েছিলেন সেটা আর শুধালুম না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

হঠাৎ মহিলাটি চমকে উঠে বললেন, 'ছি ছি! অনেক রাত হয়ে গিয়েছে; ওদিকে আপনার ডিনারের কথা আমি একবারও তুলি নি। কোথায় খাবেন বলুন?'

আমি কিন্তু-কিন্তু করছি দেখে বললেন, 'আমার ফ্ল্যাটে যাবেন? এখানেই,

বেশী দূরে না। গোডেসবের্গের সে-বাড়িতে আমি আর যাই না।'

আমি ইতিমধ্যে একাধিক বার লক্ষ্য করেছি যে মহিলাটি এখনো তাঁর ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁকে বাড়িতে শুইয়ে দেওয়াই ভালো।

মোড় নিতেই দেখি সেই প্রাচীন দিনের শেষ ঘোড়ার গাড়িখানা যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে। মহিলাটি যে-আমলের কথা বলছিলেন তখন এরও ছিল ভরা যৌবন। আমি বললুম, 'কি হে যাবে নাকি?'

টপ্ হ্যাট তুলে বাও করে বললে, 'নিশ্চয়ই, স্যর।' ঘোড়াকে বললে, 'চল্ বার্‌বা রস্‌সা—গোডেসবের্গ।'

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'না হে না—'

বললে, 'সরি, স্যর! এই বছর পাঁচেক পূর্বেও তো আপনাকে ফ্যান্‌সি ডান্‌স্ থেকে ভোরবেলা হোথায় নিয়ে গিয়েছিলুম! হা হ্‌হা, হা হ্‌হা, আপনি তখন ভারী জলি ছিলেন, স্যর, নামবার সময় ঝপ করে আমার হ্যাটটি কেড়ে নিয়ে হাওয়া। হাহ্‌হা—পরে আমার ওল্‌ড উম্যান বলে কি না আমি হ্যাট বন্ধক দিয়ে বিয়ার খেয়েছি। হাহা হাহা! চল্, বার্‌বা রস্‌সা—'

মহিলাটি হেসে উঠলেন। তাঁর চেনা দিনের ভোলা দিনের দমকা বাতাস যেন হঠাৎ গলিটাকে ভরে দিয়ে সব শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রাইন বাগে। শহরের গলির ভিতর নির্বাসিতা সুসান্ দিবাস্বপ্নে যে রকম তার গাঁয়ের নদীটিকে শহরের গলি দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছিল।*

তখনও আমার বয়েস ছিল কম, জানতুম না, আমার কপালে ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন এমনই দুর্দৈব যে তখন আমার অন্ধ কারাগারে না বইবে চেনা দিনের ভোলা দিনের বাতাস, না বইবে সুসানের গ্রামের নদী—স্মৃতির আবর্জনা উড়িয়ে নিতে ভাসিয়ে দিতে।

গাড়ি-ভাড়াটা দেবার পর্যন্ত মোকা পেলুম না।

গেট খুলে বাড়িতে ঢোকার সময় শুনি, কোচম্যান বলছে, 'চ বার্‌বা রস্‌সা, —দেখলি তো, তখনি তো তোকে বলি নি অন্য সোয়ারি নিস্ নি। আজ আর না। চ, বাড়ি যাই।' আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে 'রেতে বেরাতে যখন খুশী ঐ সামনের গলিতে ঢুকে পয়লা বাড়ির সামনে বলবেন, "ডার্লিং বার্‌বা রস্‌সা!" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাবেন তৈরী। সম্রাট বার্‌বা রস্‌সার মত আপনার

* "সরু গলির মোড়ে যখন দিনের আলো ঝরে
ময়না দাঁড়ে গাহে এমন গাইছে বছর ধরে।"
—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অনুবাদক সত্যেন দত্ত।

বার্‌বা রস্‌সাও দেখবেন ক্রুসেড লড়তে হোলি ল্যাণ্ডে যেতে তৈরী।'

জর্মন কেন, প্রায় সব জাতের লোকই কোনো বিশেষ দেশ ভ্রমণ করে এলে বা সে দেশ নিয়ে চর্চা করলে আপন বাড়ি ভর্তি করে ফেলে সে দেশের ভালোমন্দ মাঝারি রাবিশ-জাঙ্ক-বিল্‌জ-কীচ্‌শ্‌ দিয়ে। এঁর বাড়িতে পরিপূর্ণ ব্যত্যয় না হলেও একথা কেউ বলতে পারবে না যে ইনি সারাজীবন শুধু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই করেছেন। মাত্র একখানি ছবি—অজন্তার। রাহুল-জননী পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তথাগতের (তিনি ছবিতে নেই) সামনে। আর লেখা-পড়ার টেবিলের উপর সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের একটি মূর্তি। ইনি এটি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? ওটা মূলে মূর্তি কি না জানি নে—হয়তো বা রিলীফ। আমি দেখেছি ছবিতে—বহু বৎসর হল।

কিন্তু অত বড় বড় ঘরওলা ফ্ল্যাট তিনি পোষেন কি করে?

আমার অনুমান ভুল নয়। ফ্ল্যাটে ঢুকে আমাকে আসন নিতে অনুরোধ করে তিনি সোফায় শুয়ে পড়লেন। একটু মাফ-চাওয়ার সুরে বললেন, 'আপনাদের দার্শনিক সর্বপল্লী মহাশয় নাকি লেখাপড়া পর্যন্ত খাটে শুয়ে শুয়ে করেন।'

ফোটোগ্রাফে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বৃদ্ধ বয়সের যে ছবি দেখি হুবহু ঠিক সেই পোশাক পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যখণ্ড যেন ঘরে এসে ঢুকলেন। মহিলা আলাপ করিয়ে-দিয়ে বললেন, 'আমার আইমা। ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর ছেলে-নাতিরা ভালো ভালো ব্যবসা করেন। আইমা কিন্তু আমার সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসেন।'

আমি বার বার বললুম, 'আমি নিরামিষাশী নই, আমার আহারাদির জন্য তুলকালাম করে রাইনের জলে আগুন লাগাতে হবে না, আমি সব খাই, টিনের খাদ্যেও অরুচি নেই।'

মহিলা বললেন, 'জানেন কি, হিটলার কড়া নিরামিষাশী?'

আমি বললুম, 'তা হলে নিরামিষ ভোজনের বিপক্ষে আরেকটা কড়া যুক্তি পেলুম! আর আপনি?'

ক্লান্তির সুরে বললেন, 'আইমা যা দেয়, তাই খাই।'

আমি বললুম, 'আপনি তাহলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী!'

'অন্তত হিটলারের মত জৈন গৃহীও নই।'

ইনি সব জানেন।

আমাকে চেয়ারটা কাছে টেনে আনবার অনুরোধ করে বললেন, 'আচ্ছা,

আপনি নিওরসিস্, সাইকসিস্, মনমেনিয়া, ইদে ফিক্স—এসব কথাগুলোর অর্থ জানেন ?'

আমি বললুম, 'যাঁরা এসব নিয়ে কারবার করেন, তাঁরাই কি জানেন ? এই যে আমরা নিত্য নিত্য ধর্ম, নীতি, মরালিটি, রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম শব্দ ব্যবহার করি, এগুলোর ঠিক ঠিক অর্থ জানি ? তবে আপনি যেগুলো বললেন, তার ভিতর একটা জিনিস সব কটারই আছে : কোনো একটা চিন্তা সর্ব চৈতন্যকে এমনই গ্রাস করে ফেলে যে মানুষ তার থেকে অহোরাত্র চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি পায় না।'

'দুষ্মন্ত যে রকম বলেছিলেন, তিনি শকুন্তলার চিন্তা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না, অপমানিত জন যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেও অপমানের স্মৃতি মন থেকে তাড়াতে পারে না—বার বার সেটা ফিরে আসে।' তারপর বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, কালিদাস অপমানের সঙ্গে বিরহবেদনার তুলনা দিলেন কেন ? শকুন্তলা তো দুষ্মন্তকে কোনো পীড়া দেন নি—অপমান দূরে থাক !'

আমি বললুম, 'শত্রু কাছে এসে দহন করে ; মিত্র দূরে গিয়ে দহন করে। দুজনেই দুঃখ দেয়—শত্রু মিত্রে কি প্রভেদ ?

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্ব কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ?

দুশ্মন দুষ্মন্তকে অপমানিত করলে তাঁর যে বেদনা-বোধ হত, শকুন্তলার বিরহও তাঁকে সেই পীড়াই দিচ্ছিল। তাই বোধ হয় কালিদাস উভয়কে পাশাপাশি বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন পূর্বে বলেছেন, "তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন কাছাকাছি এসে গেছে। একই মন্ত্রে দুজনকে আহ্বান জানাবেন"।'

ঘরের আলো যদিও সূক্ষ্ম মলমলের ভিতর দিয়ে রক্তাঙ্গীর গোলাপী আভার মত মোলায়েম, তবু শ্রীমতী দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন।

এবারে উঠে বসে আমাকে বললেন, 'আপনাকে সর্বক্ষণ আমার আপন কথা বলে উৎপীড়িত করার ইচ্ছা আমার নেই—বিশেষ করে বাড়িতে টেনে এনে।

আর এখন বার বার মনে হচ্ছে কী লাভ ? নিউরটিক ইত্যাদি যে শব্দগুলো বললুম, তার ক'টা আমার বেলা প্রযোজ্য আমি জানি নে। কিন্তু এ-কথা দৃঢ়নিশ্চয় জানি, আমি নর্মাল নই। কখনো মনে হয়, আমার এই অনুভূতিটা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আবার হঠাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মতিভ্রম। একটা ইদে ফিক্স্—ফিক্স্ট্ আইডিয়া থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাই নে, এবং নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে আর অবিচল চিত্তে গ্রহণ করতে

পারি নে। তাই দয়া করে আপনি এই নিউরটিক, মনমেনিয়াকের কোনো কথা গায়ে মাখবেন না।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু (এবং সংস্কৃতেই বলেছিলুম)। কিন্তু আপনি কি যেন জানবার জন্য আমাকে ফোন করেছিলেন?'

'আরেকদিন হবে। আপনি এখানে আর কত দিন আছেন?'

'অন্তত দেড় মাস। কয়েকদিনের জন্য ড্যুসলডর্ফ যাবো, সেই যে বন্ধু পাউলকে ট্রাঙ্ককল্ করেছিলুম, তার ওখানে। আপনিও চলুন না।'

বললেন, 'মন্দ নয়; পরে দেখা যাবে।'

ইতিমধ্যে আইমা একটা বরফে ভর্তি অত্যুজ্জ্বল রুপালি বালতিতে করে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এক বোতল মোজেল নিয়ে এসেছেন।

আমি বললুম 'সর্বনাশ!' আইমা কি যেন একটা বললেন। শুধু 'মাটিল্ডে' শব্দটি বুঝতে পারলুম। তাহলে এর ক্রিশ্চান নাম ঐ।

তিনি বললেন, 'হোখ্ ডয়েচ্স্—হাই জর্মন—ব্যুনেন্ আউস্প্রাখে দিয়ে উচ্চারণ করার ফ্যাশান আইমার কুমারী বয়সে চালু হয় নি বলে আমরা এখনো আলজাসের ডায়লেক্ট বলি। আর বোতলগুলো যদিও অত পুরনো নয়, তবু আমার পিতার আমলের। শ্যাম্পেন নাকি পুরনো হলে খারাপ হয়ে যায়। ভালো না লাগলে মোজেলটা খাবেন।'

আমি নিজে খাই আর না-ই খাই, এর মনে যদি একটু রঙ লাগে তবে আমি খুশী।

শুধালুম, 'আপনি কি এখনো ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা রেখেছেন? আপনার বিশেষ ইণ্টারেসট্ কিসে?'

'বিষয়টা কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। এমন কি হোমযজ্ঞেও স্ত্রী-পুরুষে সমান অধিকার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ইওলজি আমার সাবজেক্ট নয়। আপনি সবিস্তার না বললে মোষের সামনে বীণা বাজানোর মত হবে।'

তিনি বললেন, 'সে কি, আপনি তো ইণ্ডিয়ান!'

আমি বললুম, 'আপনাদের ইহুদিদের মত আমারও লয়েলটি দ্বি-ধা। আমাকে আমার পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখতে হয় আর যে দেশে পুরুষানুক্রমে আছি তার অতীত গৌরবেও আমার হিস্যে আছে। তবে আমাদের দেশের মেজরিটি আপনাদের নাৎসিদের মত নয়। আমাদের মুসলমান

কবি কাজীকে হিন্দুরা মাথায় তুলে নাচে, আর সেদিন নাৎসিদের একখানা বইয়ে পড়ছিলুম, ইহুদি হাইনে সম্বন্ধে বলেছে, "১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে অপরিচিত।" উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলতে হবে! যে লোককে ১৮১৭।২০ থেকে তাবৎ জর্মনি ও পরবর্তী যুগের রসগ্রাহী বিশ্বজন চেনে তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ 'অপরিচিত' হয়ে গেলেন, যেদিন হিটলার চ্যানসেলর হলেন!'

তারপর তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এসব থাক। আপনার কথা বলুন।'

'বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্মার্ত যুগেই সেটা কমতে আরম্ভ করলো। করে করে শেষ পর্যন্ত সতীদাহ পর্যন্ত।'

তারপর তিনি যে রকম সবিস্তর ধাপে ধাপে নামতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্মৃতির আমি জানি সামান্যই—কজন হিন্দুই জানে, স্মার্ত পণ্ডিত ভিন্ন? মন্বাদি যে-সব শাস্ত্রকারদের নাম তিনি বললেন, তার বারো আনাই আমার অজানা। এবং যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো সেটা এই যে, সর্বদাই তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রত্যেক বিধানের পিছনে কি অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে সেটা খুঁজে বার করার। অন্যতম মূল সূত্রস্বরূপ তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, 'কার্ল মার্কস্ বলেছেন, "যুগান্তকারী সামাজিক বিবর্তনের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ"—কিন্তু সেটা আমি একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করি নে; সার্টেনলি, যদিও সেটা দি মোস্ট্ ইমপর্টেন্ট কারণ।' এই সূত্রটি তিনি বার বার অতি সুকৌশলে প্রয়োগ করছিলেন।

সে রাত্রে তিনি যা বলেছিলেন তার সিকিভাগ লিখতে গেলে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস বানাতে হয়!

শেষ করলেন এই বলে, 'শুনেছি, আপনাদের মডার্ণ মেয়েরা এখন নাকি তাদের সর্ব পরাধীনতা, দুরবস্থার জন্য স্মৃতিকারদের—অর্থাৎ পুরুষদের দোষ দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ ওঁদের নয়। মেয়েদেরও আছে। সে-কথা আরেকদিন হবে। আইমা নোটিশ দিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে আমি একটি গেলাস চেয়ে নিয়ে সেইটে মোজেলে ভরে আইমার জন্য রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বুড়ী প্রাচীন দিনের পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে দু'দিকের স্কার্ট সামান্য তুলে কার্টসি করলেন। বললেন, 'না বাছা, অতখানি না।' বসার ঘরে এসে মাটিল্‌ডের গেলাসে প্রায় সবখানি ঢেলে দিয়ে 'স্বাস্থ্য পান' করলেন।

আমি মাটিল্‌ডেকে বললুম, 'আপনি না বলছিলেন, আপনি নিওরটিক? কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনি যে শাস্ত্র-চর্চা করলেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত তো যুক্তিসঙ্গত প্রতিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত অনুমানের দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ

করলেন। এমন কি নিওরসিসের পুনরাবৃত্তি প্রমাদ থেকেও আপনার ধারাবাহিক প্রামাণ্যবিন্যাস সম্পূর্ণ মুক্ত।'

মাটিল্‌ডে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'নিওরসিস, অনুভূতির রোগ। তার হৃৎভূমি আমাদের হৃৎপিণ্ডে, স্মৃতিশাস্ত্র মস্তিষ্ক রাজ্যের নাগরিক।'

তারপর ভেবে বললেন, 'সেখানেও যে হৃৎপিণ্ডের নিপীড়ন একেবারে পৌঁছয় না তা নয়। সেখানেও কিছুটা 'ইদে ফিক্‌স্' এসে গিয়ে মস্তিষ্ককে নূতন কিছু করতে দেয় না। অর্থাৎ আমি সেই "স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতি" থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো নূতন কিছুর সন্ধানে লাগতে পারি নে। এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা বই বেরুলেও, ওটাতে যে কোন তত্ত্ব নেই জেনে শুনেও সেইটেই পড়ি। দেখি তার বক্তব্য কোথায় কোথায় আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্লিক্ করছে, আর কোথায় কোথায় করছে না। এতে করে কোন্ নবীন জ্ঞান সঞ্চয় হয়, কোন্ চরম মোক্ষপ্রাপ্তি!—আর ওদিকে পড়ে রইল জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভুবনের নবাবিষ্কৃত খনির নব নব মণি-ভাণ্ডার—অবহেলা অনাদরে। ঠাকুরমাকে এনে দিলুম বড়দিনের নূতন স্কার্ট, জ্যাকেট, বনেট, জুতো। ঠাকুরমা মুখ গুঁজে রইলেন তাঁর স্ত্রী-ধনের সারাটোগা সিন্দুকের ভিতর! সেনিলিটি, ভীমরতি, ইদে ফিক্‌স্!

চলুন—আইমার প্রতি সুবিচার করতে। এমনিতেই না, সেখানে অতি অবশ্য এ-সব কথা তুলবেন না।'

আইমার রান্নার বর্ণনা দেব না। সুশীল পাঠক, তোমার আশী বছরের পাকা-পাচিকা ঠাকুরমা যদি থাকেন তবে তুমি অনায়াসে বুঝে যাবে, এঁরা মিন-নোটিশে, দ্বিপ্রহর রাত্রেও কী ভানুমতীর ভোজবাজি দেখাতে পারেন।

এখানে 'ভোজ' আমি ভোজন অর্থেই নিচ্ছি। বিক্রমাদিত্য-মহিষীর ইন্দ্রজালও অবশ্য তাতে রয়েছে। আর আমাদের জনপদ কাহিনীতেও আছে, ভোজরাজদুহিতা কালিদাসকে ভোজ দিয়ে পরিতুষ্ট করতেন।

মে মাসে রাত একটায় রাইনল্যাণ্ডেও বেশ শীত পড়ে। বেরুবার সময় মাটিল্‌ডে জোর করে আমার স্কন্ধে তাঁর হাল্কা ম্যান্‌টল্‌টি চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বার্‌বা রস্‌সার কথা যে আমার মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু আমার হোটেল কাছেই।

ভেন্‌সর্বেকভেক-এ নেমেই সামনে পড়ে কাস্‌লের বোটানিক্যাল গার্ডেনের চক্রাকার পরিখা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখি অসংখ্য কুমুদিনী সৌরভজাল বিস্তার করেছে। চতুর্দিক নিঝ্‌ঝুম নীরব। আমাদের গ্রামাঞ্চলের চেয়েও নীরব—কারণ সেখানে বেওয়ারিশ কুকুর, বনের শেয়াল, দস্তী মোরগা—কেউ না

কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙবেই। দূরে কাইজার প্লাৎসে দু-চারখানা মোটরের আনাগোনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরা নিরীহ নিদ্রালুর ঘুম ভাঙানোর জন্যই যে মোটরে হর্ন থাকে সেটা এখনো জানতে পারে নি।

বুকের ভিতরটা কি রকম মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি কবি নই, আর্টিস্ট নই—আমার হৃদয় স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু অকালে বিনাদোষে হৃতযৌবনা, কিংবা আমার ছোট বোনের সখী তরুণী মাধুরীর থানকাপড়, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিধবা মল্লিকা একমাত্র রুগ্ন সন্তানকে জলে বিসর্জন দিয়ে মকরবাহিনীর কাছ থেকে লব্ধস্বাস্থ্য সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় কঙ্কণ-বলয়হীন হাত দুখানি বাড়িয়ে যখন দেখে—দেখে সব মিথ্যা, সব বঞ্চনা—এসব দেখলে কিংবা কবি দেখালে আমার মত মূঢ় জড়ভরতও চট করে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে পারে না।

আমি কি ভালোবাসি নি?—আমার মত অপদার্থ ক্ষণতরে ভালোবাসা পেয়েও ছিল—পথের ভুলে অপদার্থের প্রাণের কূলে বসন্তপবন হঠাৎ কখন এসে যায়, আর যাবার সময় ছেড়ে যায় তার অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মের খরতাপ, রৌদ্রদাহ, তৃষ্ণাবাণ। ইচ্ছা করেই। কিন্তু সে কথা থাক। খৃষ্টের বদনাম ছিল, তিনি মদ্যপ, তিনি নর্তকীকে সাহচর্য দেন। তিনি সব দেখেই বলেছিলেন, 'কাউকে বিচার করতে যেয়ো না।' পয়গম্বর বলেছেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে'—অর্থাৎ তুমি নিজে। তবে কে তোমার প্রতি অবিচার করেছে সে অনুসন্ধানে আপন জান্ পানি করো কেন?

এঁর ভিতরকার জ্বলন্ত বহ্নিশিখা এঁর মুখ আর হাত দুখানিই পুড়িয়ে ফেলল কেন? ঐ দুটিই মানুষের ভিতরকার মানুষকে প্রকাশ দেয়—সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, তার জন্ম-মৃত্যু। বিশেষ করে মানুষের হাত দুখানি প্রকাশ করে তার পরিবারের ঐতিহ্যগত স্পর্শকাতরতা, চিন্তাশীলতা কিংবা সে দুটি রসে রসে ভরা। মূঢ় জনের হাত দুখানি কচ্ছপের খোলের মত।

ইনি কি জানতেন, যখন তাঁর বন্ধুর থীসিস তিনি টাইপ করে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেকটি হরপে ঠোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আপন কফিন-বাক্সের ডালায় স্বহস্তে একটি একটি পেরেক পুঁতছেন?

স্বামী-সোহাগিনী কার্লোটা পাগলিনীর মত ছুটে এলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে প্যারিসে, তারপর গেলেন তাঁর ভাশুর প্রবল প্রতাপান্বিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটের কাছে—পায়ে পড়লেন তাঁদের, 'তোমরাই আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে মেকসিকোর সম্রাট করে। আমাকে সামান্য একমুঠো সৈন্য

দাও। আমি তাঁকে বাচাতে পারবো।'

ওদিকে স্বামী মাকসিমীলিয়ান প্রহর গুনছেন কার্লোটার প্রত্যাবর্তন কিংবা অবধারিত মৃত্যুর জন্য। দ্বিতীয়টাই হল। খোয়ারেসের আদেশে তাঁকে দাঁড়াতে হল বন্দুকধারী সৈন্যদের সামনে। এমপেরর মাকসিমীলিয়ান ক্ষাত্রধর্মের শেষ আভিজাত্যের প্রতীক—মৃত্যুবেদীতে দাঁড়াবার পূর্বে বন্দুকধারীদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি করে সোনার মোহর দিলেন।

সব খবর কার্লোটা পেলেন, প্যারিস ভিয়েনায় ছুটোছুটির মাঝখানে। তাঁর মাথার ভিতর কি যেন একটা ঘটে গেল। তাঁর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত দ্যুতি যার দিকে কেউই তাকাতে পারতো না। পারলে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাত।

তারপর দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে তিনি কথা বলতেন ওপারের লোকের সঙ্গে। আর বার বার ফিরে আসতেন ঐ এক কথায়: তাঁর স্বামীকে বলতেন, 'মাক্‌স্‌ল্‌, মাক্‌স্‌ল্‌, সব দোষ আমারই। আমারই সব দোষ।'

আমি বিমূঢ়ের মত কিছুতেই ভেবে পাই নে মানুষের দোষ কোথায়, তার পাপই বা কি পুণ্যই বা কি?

কী সদাশিব, শান্ত এই বন্‌ শহর। কিন্তু তাই কি? চেস্টনাট গাছের ঘন পাতা থেকে ঝরে পড়ল আমার হাতের উপর এক ফোঁটা হিমিকাশ্রু। কার এ অশ্রু? আমি জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে খুব কম মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো—আদৌ আসতো কি না জানি নে—তাই ছাত্রেরা প্রণয় জমাতো বন্‌-বালাদের সঙ্গে। তারপর টার্ম শেষ হতেই অনেকেই চলে যেত ভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে। তাই এ-প্রেমের নাম সেমেস্টার-লীবে বা এক টার্মের প্রণয়। কারো কারো প্রেম অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই আপন আপন অধ্যয়ন সমাপন করে উড়ে চলে যেত এদিক ওদিক। আর পড়ে রইত বন্‌-বালাদল তাদের অশ্রুজল নিয়ে।

বনের আপন তরুণ দলও এ পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত।

আমার একটি ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক বান্ধবীকে রাত্রিবেলা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরমুখো রওয়ানা হয়ে কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় শুনতে পেলুম বান্ধবী একতলার দিকে ডাকছে তার ঘুমন্ত ভাইকে নিচের সদর দরজা খুলে দেবার জন্য। আমার উল্টো দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটি তরুণ। সে ভেবেছে মেয়েটি বুঝি আমাকে ডাকছে, আর আমি সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে পাশ করার সময় মিনতি-ভরা মৃদু কণ্ঠে বললে,

'এত কঠিন হৃদয় হবেন না, যুঙার হার (ইয়াং জেণ্টলম্যান)।'

সে রাত্রে বনের গলিঘুঁচি বেয়ে বেয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলুম। মনটা বড় অশান্ত। ভোরের দিকে হঠাৎ রোঁদের একজন পুলিস আমার সামনে দাঁড়িয়ে বুটের হিলে হিলে ক্লিক করে সেলুট দিল। আমি বললুম, 'গুটেন্ আব্‌ণ্ট।'

পুলিস বলল, 'গুড মর্নিং বলাই কালোপযোগী হবে। ভোর হতে চলেছে।'

তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ক্রস করলুম। ইস্ট ভাস লোস্? এনিথিং রং?'

এ শহরের পুলিসও দরদী। আমি বললুম, 'না, অনেক ধন্যবাদ।'

বললে, 'এ রকম ছন্নের মত একা একা রাতভর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? চলো, ঐ বেঞ্চিটায় বসে আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খাবে।'

আমি নিজের প্যাকেট বের করলুম। আমার সিগারেট নিতে খুব সহজে রাজী হল না।

বললে, 'তুমি ভ্যাগাবণ্ড নও, রাস্তাও হারাও নি, এবং চুরিতে যদি হাতখড়ি হয়ে থাকে তবে সে অতি সম্প্রতি। আমি তোমাকে কিছুটা চিনি। কয়েক বছর আগে যখন এখানে ছাত্র ছিলে তখন আমার বীটেই তোমার বাসা ছিল। তারপর কিছুদিন তোমাকে না দেখতে পেয়ে বুঝলুম আর পাঁচটা ফেৎলেস টমাটোর মত (জর্মনরা কেন টোমাটোকে faithless বলে, জানি নে) পাশ করে দেশে চলে গেছে। কিন্তু জানো, তোমাকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিশ্বাস করবে না, তুমিই পয়লা বিদেশী যে পরীক্ষা পাশ করার পর চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিছু মনে করো না, আমি বড় খোলাখুলি কথা বলি। হ্যাঁ, তোমার সেই প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড বান্ধবী গেল কোথায়? তোমাদের দু'জনার চুল ছিল এই শহরের দুই একস্ট্রীম। সবাই তাকাতো।'

আমি বললুম, 'ও! মার্লেনে? সে বিয়ে করে ফ্রিজিয়ান দ্বীপে চলে গেছে।'

'তাই বুঝি ছন্নের মত—?'

আমি ধীরে ধীরে বললুম, 'না, আজ একটি মেয়ের জীবনকাহিনী শুনে বড় দুঃখ হল। মন শান্ত হচ্ছিল না।'

বললে, 'সরি।'

সিগারেট শেষ করে গুপো উঠে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার পার্সনাল ব্যাপারে আমি ঢুঁ মারতে চাই নে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। তাই শুধু বলি এই বন্ শহরে ক্রাইম এতই কম হয় যে, দুষ্টের দমন অপেক্ষা শিষ্টের পালন

করতে হয় আমাদের—অর্থাৎ পুলিসের—বেশী। আর্তের সাহায্য করতে গিয়ে কিন্তু আমি বার বার দেখেছি, সত্যকার সাহায্য করা অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। জর্মনে একটা কথা আছে: মমতায় ভরা এই যে মায়ের শরীর, যে তার বাচ্চার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে কি পারে তার মুমূর্ষু শিশুকে তার মরণে সাহায্য করতে? এইটুকু দুধের বাচ্চাকেও মরতে হয় আপন মরণ। যে অজানা পথে যেতে ত্রিশ বছরের জোয়ানও ভয় পায়, আট বছরের শিশুকেও সেই পথে পা দিতে হয়।

কে কার সাহায্য করতে পারে?

পারেন শুধু মা মেরি।

আবার দেখা হবে, য়ুঙার হ্যার, শুধু শুধু মন খারাপ না করে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর দরকার হলে পুলিসের পুৎসির খবর নিয়ো।'

বড় দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমার ছাত্রজীবনের ল্যাণ্ড-লেডি এখন থাকেন ব্যুকেবুর্গ নামক ছোট্ট শহরে। তার পাশে একটা গ্যারিসন। তিনি এসেছিলেন বলে, এবং আমার খবর জানতেন বলে আমাকে ফোন করলেন, বললেন জরুরী খবর আছে। তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলুম তাঁর প্রিয় 'আম্ রাইন' রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বিস্ময় প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি বললেন, 'নাৎসিদের গোয়েন্দাগিরি চরমে পৌঁছেছে। এঁদের অনেকেই দূর থেকে শুদ্ধমাত্র ঠোঁটের নড়া থেকে কথা বুঝে নিতে পারে। তাই বাইরেই জরুরী গোপন কথাটা সেরে নি।

'খবরের কাগজে নামগন্ধ নেই, লার্ক-হক জানে না, কিন্তু আমরা গ্যারিসনের কাছে থাকি, আমাদের কাছে ট্রুপ মুভমেণ্ট লুকানো অসম্ভব। পরশু রাতে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য গেছে চেক্-সুড্ এটেন্ সীমান্তে। লড়াই যদি আচমকা লেগে যায়, তবে আপনি ইণ্ডিয়ান, অতএব ব্রিটিশ, অতএব শত্রু। নজরবন্দী হয়ে থাকবেন। দেশ থেকে টাকা আসবে না। দুরবস্থার চরম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাই দেখেছি।'

তাঁর সদুপদেশ—না বললেও আমি বুঝলুম—ইংরেজ লড়াই হারলে যে তার নিজস্ব আবিষ্কার করা ভাষায় বলে 'বাহাদুরিকে সাথ হটনা' ('বীরত্বের সঙ্গে পলায়ন!'—শোলার পাথর বাটি, ডুববেও ভাসবেও) সেইটি আমার অবলম্বন করা।

বললুম, 'চলুন, ভিতরে গিয়ে খেতে খেতে চিন্তা করি।'

এ-রেস্তোরাঁর সঙ্গে ল্যাণ্ড-লেডির নিদেন চল্লিশ বছরের পরিচয়। মালিক, ওয়েট্রেস, সবাই উদ্বাহু হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

হঠাৎ যদি এখন আমাকে জর্মনি ত্যাগ করতে হয়, তবে তার পূর্বে মাটিল্‌ডেকে তাঁর শেষ প্রশ্ন শুধোবার একটা সুযোগ দিতে হয়।

টেলিফোনে তাঁকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানালুম আর টাপে-টোপে বোঝালুম, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ফিরে আসতে ফ্রাউ এশ্‌ ফিস ফিস করে বললেন, 'কাউণ্টারের পিছনে ঐ ওয়েট্রেসটিকে লক্ষ্য করুন। বেচারী পড়েছিল এক পিচেশের পাল্লায়। একটা গরীব ডাক্তারীর ছাত্র করে ওর সঙ্গে প্রণয়। মেয়েটি পুরো ছ' বছর ওর খরচা যোগায়। কথা ছিল শেষ পরীক্ষার পর সে তাকে বিয়ে করবে। পরীক্ষা পাসের তিন দিন পরে বদমাইশটা এক খানদানী, ধনী মেডিকেল স্টুডেণ্টকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করেছে।'

মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। আমি যে-সব ঘটনা শুনতে চাই নে সেগুলিই যেন গেস্টাপো ডালকুত্তার মত আমার পিছনে লেগেছে।

এশ্‌ বললেন, 'কিন্তু ধন্যি মেয়ে! রেস্তোরাঁর এই যে মালিক, সে মেয়েটাকে বড় স্নেহ করে। সে তো রেগে তার উকিল ভাইকে ফোন করে বললে, "লাগাও দু-দুটো মোকদ্দমা—একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানী। ব্যাটাকে আমি জেলে পচাবো, আর ব্যাটার ডাক্‌তারি লাইসেন্স দিয়ে টয়লেট পেপার বানাবো।" কিন্তু ঐ যে বললুম, ধন্যি মেয়ে, কিছুতেই রাজী হল না কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তুলতে। কী আকাট, কী আকাট মেয়েগুলো!'

আমি কিছু না বলে বিরাট এক পীস কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাটিল্‌ডের জন্য পথ চেয়ে রইলুম। দেখা পাওয়া মাত্র বাইরে গিয়ে তাকে সব কথা বললুম।

মাটিল্‌ডে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললেন, 'আমি অনেক কিছু আজ সকাল বেলা একস্‌চেঞ্জে গিয়েই জানতে পেরেছি। আমরা সব-কিছুই জানতে পাই। এমন কি, বার্লিনস্থ ফ্রান্সের রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে পর্যন্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন।

আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

খাওয়ার পর হোফ্‌ গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে স্থির হল, কাল সকালের গাড়িতে আমি প্যারিস চলে যাব। ফাঁড়াটা কেটে গেলে আমি ফের বন্‌ চলে আসবো। নইলে—সে তখন দেখা যাবে।

ফ্রাউ এশ্‌কে আমরা ম্যানস্টার গির্জে অবধি পৌঁছে দিলুম। আচার-নিষ্ঠা রমণী পথে আমার মঙ্গলের জন্য একটা বাড়তি মোমবাতি কিনলেন—মা-মেরির পদপ্রান্তে জ্বালাবেন বলে।

মাটিল্‌ডেকে একস্‌চেঞ্জে পেঁৗছে দিয়ে বললুম, 'আপনার সঙ্গে ডিনার খাবো। ক'টায় আসবো ?'

'পাঁচটার পরে যে-কোনো সময়।'

হিটলারের উপর পিত্তিটা চটে গেল। একটা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে তার ছুটিটা আরামসে কাটাতে দেয় না। কিন্তু গোস্‌সাটা অবিমিশ্র নয়। একটা অস্ট্রিয়ান ভ্যাগাবণ্ড, যুদ্ধে ছিল মাত্র করপরেল, সে কিনা আমাদের দুশমন মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর—যাঁর রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, (অবশ্য ফরাসীরা বলে, 'ইংরেজকে ভারতীয়দের সঙ্গে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে স্বয়ং "বঁ দিয়ো"—করুণাময় সৃষ্টিকর্তাও —সাহস পান না'—) এবং তাঁর স্নব্‌ কনজারভেটিভ গুষ্টিকে প্রায় চার বছর ধরে তুর্কী নাচন নাচাচ্ছে, এ-সুসমাচারটি কানে এলেই মনে হয়, ইটিকে লিপিবদ্ধ করার জন্য নয়া নয়া মথি মার্কের প্রয়োজন !

অপরাহ্ণের এই মধুর আলোতে কার না শরীর অলস আবেশে ভরে যায়। কাইজার প্লাৎসের ফোয়ারার উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনু লাগছে। পাশে, সেই ১৯৩০ থেকে পরিচয়ের বুড়ো উইলি দিশী-বিদেশী খবরের কাগজ বেচছে। জর্মন কায়দায় সে 'দি টাইমস'-কে 'টে টিমেস' উচ্চারণ করতো বলে আমরা কৌতুক অনুভব করতুম। কাছে এসে কানে কানে বললে, 'সব বিদেশী কাগজ বাজেয়াপ্ত। একটা বাজে কাগজ কি করে এসে গেছে, সক্কলের দৃষ্টি এড়িয়ে। আমার মেয়ে পড়ে বললো, প্যারিস লণ্ডনে ধুন্দুমার।' বলে পুট করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল কাগজখানা।

নাঃ! এখন পড়ে কি হবে ? তার চেয়ে তাকিয়ে থাকবো চেস্‌নাট সারির দিকে, নাকে আসবে বোটানিকসের সুগন্ধ, কানে আসবে পপেলস্‌ডর্ফের এভিনিউর কাচ্চাবাচ্চাদের খেলাধূলার শব্দ, কিংবা কারো খোলা জানালা দিয়ে পিয়ানো প্রাকটিস। কিংবা—

পা দুটো লম্বা করে একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিয়েছি।

সামনে মাটিল্‌ডে। অফিস থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথ তাঁর এইটেই। বললেন, 'কি স্বপ্ন দেখছিলেন ?'

আমি বললুম, 'সেই যে চীনা দার্শনিক বলেছিলেন, "স্বপ্নে দেখলুম আমি

প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। জেগে উঠে চিন্তায় পড়লুম, এই যে আমি ভাবছি আমি মানুষ, সে কি তবে প্রজাপতির স্বপ্ন? প্রজাপতি স্বপ্ন দেখছে, সে মানুষ হয়ে সোনালী রোদে রূপালি ঝর্নার কাছে বসে চা খাচ্ছে।"

মাটিল্‌ডে বললেন, 'স্বপ্নে যদি কিছু একটা হবেই, তবে প্রজাপতিটা লক্ষ্মীছাড়া মানুষ হতে যাবে কেন? বরঞ্চ রূপালি ঝর্না হলেই পারে। কত না পাহাড়, কত না সবুজ মাঠ, কত না পাইন বন পেরিয়ে সে হবে প্রশস্ত নদী, তার বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাবে নলরাজের রাজহংস, ভরা পালে উড়ে যাবে ময়ূরপঙ্খী, তার বুকে কখনো উঠবে ঝড়ঝঞ্ঝা, কখনো প্রতিবিম্বিত হবে পূর্ণ চন্দ্র। সর্বশেষে সে পাবে তার চরম মোক্ষ পরমা শান্তি-সমুদ্রের সঙ্গে আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে।'

আমি বললুম, 'অন্তত মানুষ এই স্বপ্নই দেখেছে: "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" —আসলে সেটা কবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন।'

'উত্তর মেঘ ও যক্ষের স্বপ্ন।'

কিছু উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললুম, 'হায় সৃষ্টিকর্তা, প্রেমের ঠাকুর! কোথায় না এ-রমণী এ-সব কথা বলবে তার দয়িতের সঙ্গে, আর কোথায় সে এ-সব বলছে আমার মত কলাগাছকে। ওমর খৈয়াম তাই পৃথিবীর উপর থুথু ফেলতে চেয়েছিলেন।'

মাটিল্‌ডে কি খবর জানতে চান, সেটা আমি মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু হায়, আমি তো তাঁকে এমন কিছু বলতে পারবো না, যা শুনে তাঁর বেদনাভার লাঘব হবে। তাই তিনি সেটা না শুধালেই আমি শান্তি পাই। কিন্তু আমি যদি তাঁকে শুধোবার সুযোগ না দি, তবে কি সেটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে না? কাল যাচ্ছি প্যারিস। যদি সত্যি লড়াই লেগে যায়, তবে আমাদের দুজনাতে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

যা হয় হবে, আমিই তাঁকে সে সুযোগ দেব।

ব্যালকনিতে লম্বমান হয়েছি দু'খানা ডেক্ চেয়ারে। বললুম, 'দুজনার ভালোবাসা যদি কোনো কমন ইনটারেস্টের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে, তবে সেটা হয় বড় প্রাণবন্ত, মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী। ব্রাউনিং আর মিসেস ব্রাউনিং দুজনা একে অন্যের মধ্যে মিশে যেতেন কবিতায় কবিতায়। এমন কি, শুষ্ক বিজ্ঞানও দুজন মানুষকে একই রসের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কথা যখনই ভাবি, তখনই মনে পড়ে প্রফেসর ও মাদাম ক্যুরির কথা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, 'আপনার এ-কথাটি কালিদাসও বলে গেছেন। "গৃহিণী, সচিব ইত্যাদি"—অতখানি আশা আমি

কখনো করি নি। এবং আমি আমাদের প্রণয়ের প্রথম দিন থেকেই জানতুম, ডিগ্রী পাওয়ার পরই তিনি চলে যাবেন আপন দেশে—না, দাঁড়ান, জানলুম কিছুদিন পরে। সংস্কৃত পড়াবার সময় তিনি মহাভারত থেকেও কিছুটা বেছে নেন। তাতে ছিল কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান। আপনি ভাববেন না, তিনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ উপাখ্যানটিই আমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তা হলে হয়তো তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু কি জানি, কে জানে—'

হঠাৎ যেন দিশে পেয়ে বললেন, 'দেখুন, কাল আপনাকে যে-কথাটা বলেছিলুম, সেটা আবার, আরো জোর দিয়ে বলি, আমি নিওরটিক, আমার মন যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তখন মনে হয়, সেইটেই ধ্রুব। আবার পরে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

হঠাৎ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'শুধু এই দশ বছরের যন্ত্রণা মিথ্যা নয়।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখি, দু-হাতের ফাঁক দিয়ে বয়ে বেরুচ্ছে চোখের জল। কত বৎসরের চাপা কান্না, কে জানে? এর পূর্বেও তিনি তাঁর বেদনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চোখ দুটি ছলছল করতেও দেখি নি। আর এ যে-ধারা নেমে এসেছে, এ তো কোনো পরিণত বয়স্কা রমণীর কান্না নয়, এ যে অবুঝ শিশুর কান্নার মত। ইনি যখন শাস্ত্রালোচনা করেন তখন মনে হয়, ইনি আমার পিতার বয়সী, দৈনন্দিন আচরণে মনে হয়, ইনি আমার বড়দিদির বয়সী। আর এখন? এখন দেখি তিনি কাঁদছেন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট, আমার অভিমানিনী ছোট বোনের মত। সে কোনো যুক্তি-তর্ক শোনে না, কোনো সান্ত্বনা মানে না। যেন সে এই বিশ্ব-সংসারে একেবারে একা—তার সঙ্গী শুধু তার চোখের জল।

কি আছে বলার, কি যায় লেখা?

কিন্তু তাঁর আত্মসংযম অসাধারণ। বছরের পর বছর চোখের জল চেপে রাখার ফলে শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ আর হাত দু'খানা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর জীবনে এই তাঁর প্রথম ভেঙে পড়া।

তাঁর কান্নার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু একটি অনুযোগ প্রকাশ করেছিলেন। ডিগ্রী লাভের কয়েক দিন পরই তাঁর বন্ধু দেশে ফিরে যান। বন্ স্টেশনে তিনি তাঁকে বিদায় দেন।

তারপর তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি না, একখানা পোস্টকার্ড না, একটি ছত্র মাত্র না। নববর্ষে, জন্মদিনেও না। সেই যে বন্ স্টেশন থেকে তিনি

বিলীন হলেন, তারপর তিনি বেঁচে আছেন কি না, সে কথাও মাটিল্‌ডে জানেন না। মাটিল্‌ডে তাঁকে দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি জানতুম, এইবারে আমার অগ্নি-পরীক্ষা আসবে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমি স্থির করেছিলুম, আমি প্যারিস পালিয়ে গিয়ে সেটা এড়াবো না।

এপার ওপার—যে পারই হোক, হয়ে যাক।

যে-প্রশ্ন তিনি বার বার শুধোতে গিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে শুধোতে পারেন নি, আমি নিজের থেকেই তার উত্তর দিলুম।

ধীরে ধীরে বললুম, 'আমি ডাঃ কাণেকে চিনি। চিনি বললে ভুল বলা হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে লৌকিকতার দু-চারটি কথা হয়েছে মাত্র।'

এবারে আমারও কড়া একটা কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তারই ছল করে ঘরের ভিতরে চলে গেলুম। ইনি এটা সয়ে নিন।

ফিরে এলে মাটিল্‌ডে শুধোলেন, 'বরোদা তো ছোট শহর ; উনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনিও বনের ছাত্র ছিলেন। সে নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় নি ?'

'না, আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু উনি কোনো কৌতূহলই দেখালেন না। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, উনি কথা বলেন অত্যন্ত কম।'

মাটিল্‌ডে এক ঝটকায় খাড়া হয়ে বসলেন। প্রথমটায় বিস্ময়ে যেন বাক্য-হারা। 'কি বললেন আপনি! পাণ্ডুরঙ কথা বলেন কম! আমার সঙ্গে তো অনর্গল কথা বলতেন!'

মনে পড়ল আমার বন্ধু সোহরাব ওয়াডিয়ার মন্তব্য। পাণ্ডুরঙ শঙ্কর কাণে সম্বন্ধে। বললুম, 'যখন দেখলুম তাঁর কৌতূহল অত্যন্ত কম, তখন আমিও তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নিই নি। তৎসত্ত্বেও তাঁর কথা উঠলে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, আপন জনের মাঝখানে—ঐ যে আপনি বললেন—উনি অনর্গল কথা বলেন।'

মনে হল, মাটিল্‌ডে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কি ? কবি রুমীর দিকে তাঁর গুরু রাস্তায় তাঁকে ক্রশ করার সময় একবার মাত্র একটুখানি স্মিতহাস্য করেছিলেন। সেইটুকুর অনুপ্রেরণায়ই তিনি রচলেন তাঁর মহাকাব্য।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটুকু বলার সময় এসেছে।

আমি বললুম, 'মাটিল্‌ডে, ডাঃ কাণের কি করা উচিত ছিল না-ছিল সে জানেন বিধি। হয়তো আপনাকে যাবার পূর্বে সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হত, হয়তো না করে ভালোই করেছেন। আপনি যদি নিওরটিকই হয়ে গিয়ে থাকেন

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—তা হলে উনি যাই করতেন না কেন, আপনি ভাবতেন, তার উল্টোটা করলেই ভালো হত।

কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা এই: কাণে বরোদার রাজ-প্রাসাদের গোপন-বিভাগে কাজ করেন। সেখানকার আইন অনেকটা ফরেন অফিসের মত। জানেন তো, বিদেশিনীকে বিয়ে করাও ওদের মানা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-অনুমতিও তারা দেয়—ওদের সিনিকাল বিশ্বাস, বরঞ্চ মানুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে জিনিস গোপন রাখতে পারে, প্রণয়িনীর কাছ থেকে কিছুতেই নয়; এই তো সেদিন গ্যোয়েবলসের মত প্রতাপশালী মন্ত্রীও এই ধরনের ব্যাপারে হিটলার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছেন। নেটিভ স্টেট মাত্রই চক্রান্তের চাণক্যালয়—আর রাজপ্রাসাদ! সেখানে পরস্পরবিরোধী একাধিক গোপন বিভাগ একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ চক্রান্ত-কর্মে মত্ত। আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ধরা পড়তোই এক দিন না এক দিন, এবং তাঁর শত্রুপক্ষ যে সেটা কিভাবে কাজে লাগাতো তার কল্পনাও আমি করতে পারি নে। কাণেকে বৃহৎ সংসার পুষতে হয়—তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম।'

দাঁড়িয়ে বললুম, 'এইবারে উঠি। কাল প্রভাতে প্যারিস গমন। হিটলার আমার সব প্রোগ্রাম তছনছ করে দিয়েছেন। সবাইকে আজ রাত্রেই চিঠি লিখে জানাতে হবে। তার উপর প্যাকিং রয়েছে।'

মাটিল্‌ডে যেন চিরকালের মত দাঁড়ালেন। আমার কাঁধের উপর হাত রেখে প্রায়ান্ধকারে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হল, আমি যেন তাঁর চোখে একটুখানি জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলুম। সত্য জানেন অন্তর্যামী।

কিন্তু মিথ্যে বলেছিলুম আমি মাটিল্‌ডেকে। অন্তর্যামী যেন ক্ষমা করেন। আমি কাণের সাফাই গাই নি। আমি চেয়েছিলুম, মাটিল্‌ডের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া তাঁর বল্লভ যেন ধূলিতলে লুণ্ঠিত না হয়। মাটিল্‌ডের জীবন তারই উপর নির্ভর করছে।

প্যারিসে পৌঁছনো মাত্রই শুনি, চেক সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। হিটলার সৈন্য অপসারণ করেছেন। আমি আমার জাহাজের প্রিয়ার অনুসন্ধানে বেরুলুম না। কারণ, বনে থাকতেই তাঁর রোদনভরা প্রথম চিঠি পাই, 'আমি এখানে বাঁচবো কি করে? এ যে বড় হৃদয়হীন জায়গা। তুমি এখানে চলে এসো না, ডার্লিং।'

ভাগ্যিস্ আমি যাই নি। দু' দিন পরে দুসরা চিঠি 'কাল সহকর্মীদের সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ভেরি ইনটারেসটিং! মনে হচ্ছে, এখানে তিন বছর কাটাতে পারবো।' সাদা চিঠির কাগজে সাদা কালিতে লেখা প্রিয়ার প্রাঞ্জল বাণীটি বুঝতে আমার লহমা-ভর সময়ও লাগে নি। বস্তুত প্রথম চিঠি থেকেই সেটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। যে বলে, 'প্যারিস হৃদয়হীন', সে নিশ্চয়ই সেখানে পেঁছিনো মাত্রই পড়ি-মরি হয়ে, উদোম হিয়া নিয়ে হিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছিল। ধন্য আমি, এহেন উদারহৃদয়ার সঙ্গে আমার হার্দিক পরিচয় হয়েছিল। ইনি কাণে গোত্রের নন; নিঃশব্দে, নীরবে মহাশূন্যে লীন হন না। প্যারিস ধন্য। মার্কিন প্রবাদ আছে, পুণ্যশীল মার্কিন মাত্রই মৃত্যুর পর জন্ম নেয় প্যারিসে।

আম্মো বেকার দিন কাটাই নি, কারণ, আমার যে কোনো কাজ নেই। করে করে তিন দিনের জায়গায় কেটে গেল দু' মাস। সর্বনাশ! প্যারিস বড়ই সহৃদয়, কিন্তু দরাজ-দিল নয়। কিপটেমি শিখতে হলে প্যারিসের খাঁটি বাসিন্দাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ বাসই যথেষ্ট। শেষটায় রু দ্য সমরারের ইণ্ডিয়া-ক্লাবে জাতভাইদের সর্বনাশ করে তাদের তহবিল তছরূপ করে বিজয়গর্বে বন্ ফিরে এলুম। একদা নেপোলিয়ন যে-রকম প্যারিস থেকে বেরিয়ে হেলায় কলোন-বন্ জয় করেছিলেন।

মাটিল্‌ডেকে আমার উপর বেশী চাপ দিতে হল না। আমি সুড়সুড় করে তাঁর ফ্ল্যাটেই ঢুকলুম।

রবিবারে একসঙ্গে গির্জেয় গেলুম।

আইমা দেখি কাণের কাছ থেকে বেশ দু-চারটে ইণ্ডিয়ান ডিশ বানাতে শিখে নিয়েছিলেন। আর মাত্র তিন দিন বাকী। ভেনিস বন্দরে জাহাজ ধরে বোম্বাই পাড়ি দেব। ট্রাভেল আপিসে ভেনিস অবধি ট্রেনের টিকিট কেটে বাড়ি ফিরে দেখি ধুন্দুমার। গলা-কাটা মুর্গীর মত দুই রমণী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! কাণে রাজপ্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে মাটিল্‌ডেকে কেব্‌ল্ করেছেন, ভারতীয় ডাক্তারের উপদেশে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত তাঁর ছেলেকে ইয়োরোপ পাঠাচ্ছেন। মাটিল্‌ডে তার দেখ্-ভাল্ করতে পারবেন কি না যেন কেব্‌ল্ করে জানান।

মাটিল্‌ডের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি কেব্‌লের জবাব তো দিয়েছেনই, এখন বসে গেছেন আরেকটা কেব্‌লের মুশাবিদা করতে। আর আমাকে প্রশ্ন, ছেলেটার বয়স কত, কি ব্যামো হতে পারে, সে নিরামিষাশী কি

না, এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন সে নামবে কোন্ বন্দরে? তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে চান, নইলে তাকে দেখবে কে? মুশাবিদা বন্ধ করে ফোন করেন কখনো বা ট্রাভেল আফিসকে কখনো বা তাঁর দপ্তরকে পাওনা ছুটির মঞ্জুরীর জন্য। হঠাৎ সব কিছু বন্ধ করে লেগে যান প্যাক করতে—হয় যাবেন মার্সেই, নয় রোম। সেখান থেকে ইটালিয়ান যে কোনো বন্দরে পৌছনো যায় ঘণ্টা কয়েকের ভিতর। নইলে এখান থেকে খবর পেয়ে তিনি ইটালিয়ান বন্দরে পৌছতে না পৌছতে জাহাজ হয়তো ভিড়ে যাবে সেখানে। ট্রাভেল দফতর অভয় দেয়, তিনি মানেন না। ইতিমধ্যে তারা পিয়ন মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বোম্বাই-ভূমধ্যসাগরের তাবৎ জাহাজ কোম্পানির টাইমটেবল। আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে লেগে গেলুম গভীর মনোযোগ সহকারে।

তাঁর দ্বিতীয় কেব্‌ল্ যাওয়ার পর মাটিল্‌ডের মনে জাগলো আরেক ঝুড়ি বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্ন। তৃতীয় মুশাবিদায় তিনি বসে যান।

হাত নিঙড়াতে নিঙড়াতে পায়চারি করেন আর বলেন, 'মাইন গট্, মাইন গট্'—'হে ভগবান, হে ভগবান!'

হঠাৎ ছুটে এলেন আমার কাছে। মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আর্তকণ্ঠে শুধালেন, 'হঠাৎ যদি যুদ্ধ লেগে যায়, তবে কি হবে?' আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'নিরপেক্ষ সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন। সেখানে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।' যক্ষ্মা হলে যে সেখানেই যেতে হবে সে কথা আর তুললুম না। শুধু বললুম, 'বরোদার কেব্‌ল্ মহারাজার অজানতে আসতে পারে না; আপনি তাঁর সাহায্য পাবেন। জর্মন পররাষ্ট্র দফতর বরোদার মহারাজকে প্রচুর সম্মান করে।' তিনি আশ্বস্ত হলেন।

গভীর রাত অবধি পাশের ঘরে তাঁর মৃদু পায়চারি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, তিনি মনস্থির করেছেন, আমার সঙ্গে পরের দিন ভেনিস যাবেন।

ট্রেনে উঠেই তিনি হঠাৎ অত্যন্ত শান্ত হয়ে গেলেন। ভেনিস না পৌছনো পর্যন্ত এখন আর কিছু করার নেই।

গভীর রাত্রে স্লীপিং কোচের ক্ষীণালোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কী প্রশান্ত মমতাময় তাঁর মুখচ্ছবি! খানিকক্ষণ পরই ইটালিতে ঢুকবো—যে দেশের মাদোন্না-মাতৃমূর্তি সর্ব বিশ্বে সমাদৃত হয়। আমার মনে হল আমার এই মাটিল্‌ডের মুখে যে মাদোন্নার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এ ক'দিন ধরে প্রহরে প্রহরে, সে তো যে কোনো গীর্জার বেদীকে উজ্জ্বল করে দিতে পারে। এ

রমণী গর্ভে সন্তান না ধরেও মা-জননী মাদোন্নাদের ভিতর শাশ্বত আসন পেল।

কেন পাবে না? জাতকে আছে, একদা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় এক ভিখারিণী নগরপ্রান্তে খর্জুর বৃক্ষের অন্তরালে শিশুসন্তান প্রসব করে পৈশাচিক ক্ষুধার উৎপীড়নে গ্রাস করতে যাচ্ছিল তাকে। তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বন্ধ্যা শ্রেষ্ঠিনী, সন্তান কামনা করে মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে। মাতৃস্নেহাতুরা অনুনয় করে নবজাতককে কিনতে চাইলেন। পিশাচিনী অট্টহাস্য করে উত্তর দেয়, তার ক্ষুধা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করতে পারবে না। বরনারী বললেন, 'তবে তিষ্ঠ; এই যে আমার বন্ধ্যাবক্ষের সুপুষ্ট স্তন, অকর্মণ্য নিষ্ফল এ স্তন কোনো শিশুকে দুগ্ধ যোগাতে পারে নি—এটা আমি খর্জুরপত্র দ্বারা কর্তন করে তোমাকে দেব। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে।' পাগলিনী আবার অট্টহাস্যে বললে, 'তুমি জানো না, আপন হাতে আপন মাংস কর্তন করাতে কী অসহ বেদনা, তাই বলছ।' রমণী বাক্যব্যয় না করে কর্তন আরম্ভ করতে না করতেই দরদর বেগে নির্গত হল সেই বন্ধ্যা স্তন থেকে রক্তের বদলে অফুরন্ত মাতৃদুগ্ধ। ভিখারিণী শিশু উভয়েই সে দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হল। অলৌকিক অবিশ্বাস্য এ ঘটনার কথা শুনে তথাগতের শিষ্যরা তিনজনকেই নিয়ে এলেন তাঁর সামনে। অমিতাভ সানন্দে বললেন, 'মাতৃস্নেহ অলৌকিক ক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম।'

বাঞ্ছিতা মাটিল্‌ডের মুখে দিব্য জ্যোতি দেখা দেবে না কেন?

ভেনিস বন্দরে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাটিল্‌ডে আমার হাত ধরে বার বার অনুরোধ করলেন, আমি যেন বোম্বাই পৌঁছেই কেব্‌ল্ করি, ছেলেটি কবে কোন্ জাহাজে ইয়োরোপ পৌঁচচ্ছে। তাঁর চোখে জল, কিন্তু তাতে আনন্দের রেশও ছিল।

বোম্বাই পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, ছেলেটি চলে গেছে। মাটিল্‌ডেকে পাকা খবর জানিয়ে দিলুম।

বরোদায় পৌঁছবার মাসখানেক পরে বন্ধু ওয়াডিয়া—তাঁকে এসব কিছুই বলি নি—কথায় কথায় বললেন, কাণের ছেলেটি কখন যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে কেউ টের পায় নি। খাটের উপর একখানা চিরকুট পাওয়া যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে চিরজীবন কারো বোঝা হয়ে থাকতে চায় নি।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় নি। হা, হতভাগ্য! তুমি জানতেও পারলে না, স্বয়ং মা মেরি তোমার জন্য বন্দরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন!

আর মাটিল্‌ডে!

প্রেমের প্রথম ভাগ

সর্বপ্রথমই করজোড়ে নিবেদন, এ অধম মরালিটি ইমমরালিটি কোনো কিছুই প্রচারের জন্য এই 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক ফর বিগিনার্স ইন লভ্' লিখতে বসে নি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি প্রাচীনপন্থী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে নিই—যাতে করে আমার প্রতি অবিচার না হয়—মডার্ন কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পেট-কাটা ব্লাউজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে না আছে আমার কোনো অভিযোগ, না চাই আমি দেশের জনসাধারণকে—তন্মধ্যে আমি নিজেও আছি—খৃষ্ট-বুদ্ধ রূপে দেখতে। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনসাধারণে রটে গেছে, আমি নাকি ঐ বস্তুর শত্রু। এটা আমার প্রতি বেদরদ জুলুম। প্রথমত, জনপ্রিয় কোনো জিনিস, অভ্যাস বা আদর্শের শত্রু হতে আমি কিছুতেই সম্মত হই নে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে পথে যে সব খানাখন্দ পড়ে, সেগুলোর প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তো ওঁদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বস্তুত আমি নিজেই একখানা লিখব বলে স্থির করেছি। তবে নিশ্চয়ই জানি অধুনা যেগুলি জনপ্রিয় তার চেয়ে আমার বই অনেক নিরেস হবে; ভরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।

তবে আমার এ 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক' লেখার সময় ইতিহাসের শরণ নেব অল্পই। যদিও আমার মনে হয়, পেট-কাটা বা টপ-লেসের নিন্দায় যখন হরিশ মুখুজ্যেরা কলরব করে ওঠেন তখন আধুনিকাদের উচিত একটুখানি ইতিহাসের পাতা উল্টোনো, কিংবা ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শনভূমি মিউজিয়মে গমন। জাতকে আছে, একটি জেদী রমণী বসন্তোৎসবে যাবার সময় একটি বিশেষ রকমের দুর্লভ ফুল কামনা করে তার স্বামীকে রাজার বাগানে চুরি করতে পাঠায়। ধরা পড়ে বেচারা যখন শূলে চড়েছে তখন সে তার নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর জন্য রোদন করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ করছিল এই বলে, 'আমি মরছি তার জন্য আমার দুঃখ নেই, প্রিয়ে; আমার ক্ষোভ, তুমি তোমার প্রিয় পুষ্পপ্রসাধন করে যে বসন্তোৎসবে যেতে পারলে না তার জন্য।'

তা হলে সপ্রমাণ হল, তথাগতের যুগেও রমণী ফ্যাশানের জন্য এমন ফুলও কামনা করতেন, যেটা শুধু রাজবাড়িতেই পাওয়া যেত, এবং সেটা যোগাড় করার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলস্বরূপ তিনি বিধবা হতেও রাজী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, সে-যুগের স্বামীসম্প্রদায় অতিশয় দার-নিষ্ঠ ছিলেন। প্রিয়ার

মনোরঞ্জনার্থে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই দৃষ্টান্ত কি এ-যুগের যুবক-সম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করবে না?

অবশ্য পাঠক বলতে পারেন এ ধরনের ঘটনা সাতিশয় বিরল।

সাতিশয় বিরলই যদি হবে তবে আমাদের কবিগুরু ঐ ধরনের উদাহরণই জাতক থেকে নেবেন কেন?—

'—বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।'

এবং যেন এ-কবিতাতেই প্রোপাগাণ্ডা কর্ম নিঃশেষ হল না বলে কবি বৃদ্ধ-বয়সে ঐ বিষয় নিয়ে আরো মনোরঞ্জক, আরো চিত্তচাঞ্চল্যকর গীতি-নৃত্য-নাট্য 'শ্যামা' রচনা করলেন।

এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, আমার যতদূর মনে পড়ছে মূল জাতকে গল্পটি একটু অন্যরকমের। আমার স্মৃতিশক্তি হয়তো আমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে, উত্তীয়কে কোন কিছু না বলেই তাকে শ্যামা নগরপালের কাছে পাঠায়। তাকে আগের থেকেই শ্যামা বলে রেখেছিল, কিংবা উত্তীয়েরই হাত দিয়ে চিঠি লিখে তাকে জানায়, পত্রবাহককে শূলে চড়াও; বজ্রসেনকে মুক্তি দাও। এবং বোধ হয় ঘুষের টাকাও কিছু ছিল, আর সেটাও উত্তীয় তার আপন ভাণ্ডার থেকেই দিয়েছিল—তাবৎ ঘটনার কোনো কিছু না জেনেশুনেই। আবার মাফ চাইছি, ভুল হতে পারে, শ্যামা বোধ হয় উত্তীয়কে বলে 'তুমি এই চিঠি ও অর্থ—' সেটা শ্যামার কিংবা উত্তীয়ের—'নগরপালকে দিয়ে এলে আমি একান্ত তোমারই হব।'*

পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি শ্যামা বা পুষ্পবিলাসিনীর কার্যকলাপ

---

* রবীন্দ্রনাথ জাতক, ইতিহাস ও অন্যান্য কিংবদন্তীমূলক যে সকল কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কি কি পরিবর্তন করেছেন, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা করে কেউ ডক্টরেট নেন না কেন?

সম্মতির চোখে দেখছি। আধুনিকাদের অধঃপাতগমনের অহেতুক অভিযোগ কানে এলে আমার এসব দৃষ্টান্ত মনে আসে, এই মাত্র।

তবে এ নিয়ে ভাববার আছে।

যে কালে মুরুব্বীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিতেন, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মুরুব্বীদের ভিতর ভালো বর পাওয়ার জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না তা নয়। বস্তুত যে কনের সঙ্গে লোভনীয় বরের বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে নাকি উড়ো চিঠি পর্যন্ত যেত তৃতীয় কন্যাপক্ষ থেকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংগ্রামে আবার নীতি কি! এবং কিছুমাত্র নতুন তত্ত্ব নয় যে, কুরু-পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ যুগে, বিশেষ করে কলকাতা এবং অন্যান্য বড় শহরে অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বরের সন্ধানে বেরুতে হয়। এবং বররাও বেরোন কন্যার সন্ধানে। ফলে বিত্তশালী, রূপবতী বা উচ্চশিক্ষিতা যার যেমন অভিরুচি—কনের জন্য ছোকরাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়, এবং উল্টোটাও হয়। বোধ হয় সুলেখক সুবোধ ঘোষের গল্পেই পড়েছি, তিনটি মেয়ে তিনটি ফুলের তোড়া নিয়ে পাল্লা দেন এক শ াসালো বরকে স্টেশনে সী-অফ করতে গিয়ে।

এসব বিয়ে যে দেখা মাত্রই দুম্ করে স্থির হয় না সে-কথা বলা বাহুল্য। কিঞ্চিৎ পূর্বরাগ, প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো স্থলে এটাকে কোর্টশিপও বলা হয়। আমাদের দেশে একদা গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন ছিল। সে বিবাহ হত বিবাহের পূর্বেকার প্রণয়ের ভিত্তিতে।

কিন্তু এদেশে এখনো প্রণয়ের কোনো কোড্ নির্মিত হয় নি, অর্থাৎ যুবক-যুবতীতে কতখানি প্রণয় হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে আশা করতে পারে যে এবারে অন্য পক্ষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, এবং তখন যদি সে হঠাৎ তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তবে সমাজে তার নিন্দা হয়। ইয়োরোপে মোটামুটি দুটো ধাপ আছে। দু'জনাতে প্রণয় হওয়ার ফলে যদি ছেলেটা মেয়েটিকে ফরাসীতে 'আমি', জর্মনে 'ফ্রয়েণ্ডিন্' ('গার্লফ্রেণ্ডে'র চেয়ে এটাকে ঘনিষ্ঠতর বলে ধরা হয়) বলে উল্লেখ করে তার তখনো মোটামুটি বিয়ের দায়িত্ব আসে না। এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু ফরাসীতে 'ফিয়াঁসে'—জর্মনে ঐ একই শব্দ বা 'ফেরল্‌বট্' ব্যবহৃত হয়—পর্যায়ে পৌঁছলে সেটাকে দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। এবং সে সময় যদি যুবক তাকে এন্‌গেজমেণ্ট আংটি দেয় (অর্থাৎ মেয়েটি তখন 'বাগদত্তা' হল যদিও অর্থটা কিছু ভিন্ন) তবে সেটা বিয়ের প্রতিশ্রুতি

বলেই ধরা হয়। তারপর সে বিয়ে করতে না চাইলে অনেক স্থলে মেয়েটি আদালতে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা করে খেসারতি চাইতে পারে। সমাজে বদনাম তো হয়ই। মহাভারতে রুক্মিণী বাগদত্তা ছিলেন বলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা করে।

এদেশে প্রণয়ের কোনো স্তরেই বোধহয় এরকম আংটি দেবার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। তবে প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার পর (কতটা ঘনীভূত এবং তার চিহ্ন কি, সেটা বলা কঠিন) যদি কোনো পক্ষ অকারণে 'রণে ভঙ্গ' দেয়, তবে তার যে বদনাম হয় সেটা সুনিশ্চিত। ইয়োরোপেও যে-মেয়ে অকারণে একাধিক প্রণয়ীকে পর পর ত্যাগ করে সে 'জিল্‌ট' এই বদনামটি পায়।

নিছক প্রেমের জন্য প্রেম—বিয়ে করার উদ্দেশ্য কারোরই নেই—এটা বোধ হয় এদেশে বিরল। ইয়োরোপে মোটেই বিরল নয়। ছাত্র, ছাত্রী, মেয়ে কেরানী, ছোকরা এসিসটেণ্টের ভিতর এ-জাতীয় প্রেম আকছারই হয়। এ-জাতীয় প্রণয়ের ফলে যদি কোনো কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় তবে কোনো কোনো স্থলে সে যুবকের বিরুদ্ধে খেসারতির মোকদ্দমা আনতে পারে। আমি যতদূর জানি, বিয়ে করতে বাধ্য করাতে পারে না—তবে রাশাতে বোধহয় সন্তানটি অন্তত পিতার নামটা আইনত পায়, অর্থাৎ জারজ রূপে ঘৃণার পাত্র হয় না। ইয়োরোপে যদি যুবা প্রমাণ করতে পারে যে, মেয়েটার একাধিক প্রণয়ী ছিল তবে তাকে বা অন্য কাউকে কোনো খেসারতি দিতে হয় না। এক বলশেভিক আমাকে বলেন, এক্ষেত্রে রাশায় সব ক'জনাকে খেসারতি ভাগাভাগি করে দিতে হয়।

তবে ইয়োয়োপের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে প্রেমের মারফতে বিয়ে করেছে বলে অনেক কিছু জানে, এবং আর পাঁচজন বিচক্ষণ বান্ধবীদের কাছ থেকে উপদেশও পায়।

এদেশের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র নেই। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে আমাদের মেয়েরা বড় অসহায়।

* * *

সিরিয়স প্রবন্ধ লিখব বলে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রণয়, বিবাহ, লাভ ফর লাভস্ সেক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফরাসীদের দু-একটি মতামত লিখতে যাচ্ছিলুম মাত্র। এ বাবদে ফরাসীদের অধিকারই যে সব চেয়ে বেশি, সেকথা বিশ্বজন মেনে নিয়েছে। লোকে বলে অবাধ অবৈধ প্রেম নাকি ঐ দেশেই সব চেয়ে বেশি। আমি কিছু বলতে নারাজ, তবে একটা কথা জানি। ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ ফরাসীরা নেক্‌নজরে দেখে না। পারিবারিক শান্তি ও শিশুদের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বড়ই সচেতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই কিঞ্চিৎ অসংযমী হলে ফরাসী সমাজ সয়ে নেয়, কিন্তু তারা একে অন্যকে ডিভোর্স করতে চাইলে সমাজ অসন্তুষ্ট হয়।

ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলো যে-স্থলে গিয়ে পৌঁচেছে আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আমি ইয়োরোপের প্রেম তথা বিবাহ-পদ্ধতির নিন্দা করছি। বস্তুত বাইরের অন্য সভ্যতা অন্য ঐতিহ্যের মানুষ হয়ে আমার পক্ষে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিচার করতে যাওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁরা আমার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত সত্য দেখতে পান তাঁরাই বোধহয় অনাসক্তভাবে আপন দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ধরেন)। এদেশের ঐতিহ্য তাকে প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অন্য প্যাটার্ন বানাতে শেখাবে—এই আমার বিশ্বাস।

* * *

যে ফরাসী যুবতী কয়েকটি তরুণীকে হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আমোদ অনুভব করছিলুম। তরুণীদের ভাবভঙ্গি-কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা যুবতীটিকে প্রেমের ভুবনে রীতিমত 'সাকসেসফুল' বা বিজয়িনী বলে মনে করছিলেন। তিনি খাচ্ছিলেন কন্যাক্ ও চেসার, অতি ধীরে মন্থরে। অর্থাৎ সামান্য কয়েক ফোঁটা কন্যাক্ পান করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গেলাস থেকে এক ঢোক জল। এই জল কন্যাক্‌কে chase করে নিয়ে যায় বলে একে বলে 'চেসার'। যুবতীটি যে পান বাবদে শুধু সমজদার তাই নয়, আমার মনে হল তিনি এ বাবদে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও বজায় রাখেন।

লম্বা হোল্ডারে সিগরেট ধরিয়ে, ঊর্ধ্বপানে ধুঁয়োর একসারি চক্কর চালান করে বললেন, 'লেয়োঁ ব্লুমের কেতাবখানা মন দিয়ে পড়ো। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক খাঁটি কথা বলেছেন।' ব্লুম একদা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর বইয়ে বলেন, প্রেম, যৌনজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ সাধারণত তাদের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য সুখশান্তি দিতে পারে না। উচিত, উভয় পক্ষেরই এ-সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর বিয়ে করা। বলা বাহুল্য, এ বই প্রকাশিত হলে ইংলণ্ডের অনেকেই এটাকে 'শকিং' 'গর্হিত' বলে নিন্দা করেছিলেন।

সুন্দরীটি ব্লুমের মূল বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে বললেন, 'দেখো, আমি নিজে বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষ দুই যুযুধান শক্তি, একে অন্যের শত্রু—'

একটি তরুণী কফির ঢোক গিলতে গিয়ে মারাত্মক বিষম খেয়ে বললে, 'আপনি

এ কি কথা বলছেন! কবি দুগ্যাঁ এখনো আপনার কথা ভুলতে পারেন নি—আপনি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরও। এখনো তাঁর মুখে ঐ এক মন্ত্র: আপনার মত প্রাণ-মন, সর্বহৃদয়, সর্বস্ব দিয়ে এরকম আত্মহারা হয়ে কেউ কখনো ভালোবাসতে পারে নি।'

যুবতী স্মিত হাস্যভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেচারী আঁদ্রে! তোমার এখনো অনেক-কিছু শেখবার বাকি আছে। আমি আর্টিস্ট। আমি যা-ই করি নে কেন, সেটাকে পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে করি। যখনই ভালোবেসেছি, 'আত্মহারা' হয়েই ভালোবেসেছি। কিন্তু, ডার্লিং, ইহুদিও কি তার ব্যবসা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে না? তাই বলে সে কি তার মুনাফার কথা ভুলে যায়? যে ব্যবসাকে সে আপন প্রিয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাকে সে অকাতরে বিসর্জন দেয় না, যদি দেখে সেটা দেউলে হয়ে যাওয়ার উপক্রম?

তাই বলছিলুম, পুরুষ রমণীর শত্রু। যে কোনো পুরুষ আমাকে 'আত্মহারা' হয়ে ভালোবাসলেও একদিন সে আমাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে—আমি যে-রকম মঁসিয়ো দুগ্যাঁকে দিয়েছিলুম। অবশ্য আমি স্যাডিস্ট নই, তাই তাকে ড্রপ করার সময় যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে সেটা সম্পাদন করি—তদুপরি বলা তো যায় না, কখন কাকে আবার প্রয়োজন হয়!'

আরেকটি তরুণী বললে, 'কিন্তু দান্তে—?'

মাদাম বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি—যদিও ওঁর কাব্য আমার প্রেমপত্রে কাজে লেগেছে। ঐ ধরনের মানুষ আমি দেখি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, যারা কারো বিরহে বা মৃত্যুতে দীর্ঘদিন ধরে আপসা-আপসি করে সেটা শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, এই-বারে তার অন্য ব্যবসা ফাঁদা উচিত। মনস্তত্ত্বে ওদের বলা হয় ম্যাজোকিস্ট্—নিজকে নিজে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। ঐ যে-রকম অনেক সর্বত্যাগী অনাহারে থেকে সুখ পান! তোমার আমার স্বাস্থ্য আছে, ক্ষুধা আছে, আমরা নর্মেল্। খাদ্য যখন রয়েছে তখন উপোস করবো কোন্ দুঃখে?'

'তবে কি একনিষ্ঠ প্রেম বলে কিছুই নেই?'

'কী উৎপাত! কে বললে নেই? নিশ্চয়ই আছে। যখন যাকে ভালোবাসবে তখন তার প্রতি একনিষ্ঠ হবে, আঁদ্রের ভাষায় আত্মহারা হবে। একাধিক জনের সঙ্গেও অক্লেশে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ঐ তো আমার এক বন্ধু ছিলেন লিয়োঁতে। সেখানে মাঝে মাঝে উইক-এণ্ড করতে যেতুম। চমৎকার কথাবার্তা

বলতে জানেন। বাড়িটিও সুন্দর। প্যারিসে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমার ফ্ল্যাটে আসতেন আরেক বন্ধু। উনি বিবাহিত। অন্য সময় সুযোগ পেতেন না। তা ছাড়া চাকরির উন্নতির জন্য অফিসের এক বৃদ্ধ কর্তার সঙ্গে তাঁর মোটরে মাঝে মাঝে বেরুতে হত। তিনি আবার ভয়ানক ভীতু। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই রাত্রে মোটরে করে শহর থেকে দূরে যেতে হয় তাঁর সঙ্গে। এদের প্রত্যেককে যদি একনিষ্ঠভাবে না ভালোবাসি তবে—ঐ যে বললুম পুরুষ মাত্রই শত্রু—সে শত্রু ধরে ফেলবে না আমার ভারসেটাইলিটি—বহুমুখী প্রতিভা? শুনেছি, এবং বিশ্বস্তসূত্রেই, যে রসরাজ কবি, যোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, শাসনকর্তা দান্নুন্দ্‌জিয়ো একসঙ্গে একগণ্ডা সুন্দরীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের উচ্চাঙ্গ সাধনা করেছেন, তিনি একই সময়ে চারজনকে যে চার সিরীজ প্রেমপত্র লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অতিশয় অরিজিনাল মাধুর্যময় কবিত্বপূর্ণ—কোনো সিরীজের সঙ্গে কোনো সিরীজের সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটি বল্লভা আপন সিরীজ পেয়ে ধন্যা হয়েছেন।'

তারপর আরেক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যুজান্, তুমি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। পল্ আর মার্সেল তোমাকে একই সময়ে ভালোবাসতো; আর তুমি মাত্র দুটোকে সামলাতে পারলে না? হায়! প্যারিস কোথায় এসে পৌঁচচ্ছে? আর ডার্লিং স্যুজান্, তুমি নাকি জানতেও না, পল্ আর মার্সেল উভয়েরই তখন আরেক প্রস্ত প্রিয়া ছিল!'

স্যুজান্ তাজ্জব মেনে বললো, 'তাই নাকি? মঁ দিয়ো!'

নানেৎ বললে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল? দ্বিধা করে সিধা রাখো?'

মাদাম বললেন, 'ও! তা কেন? মেনাজ্ আ ত্রোয়া (menage a trois = management by three) যদিও এখন ফ্রান্সে একটু আউট অব ডেট্—তবু তিনজনে মিলেমিশে থাকাটা তো ট্রায়েল পেতে পারে, কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, শান্তিভঙ্গ যেন না হয়, নো স্ক্যাণ্ডাল, প্লীজ! আর ডুয়েল, খুন, আত্মহত্যা এগুলো তো বর্বরতার চরম—ভুল বললুম, বর্বরদের ভিতর এসব অপ্রিয় ঘটনা প্রায় কখনোই ঘটে না। এগুলো ঘটলে মনের অশান্তি খানিকটে হয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক বদনাম ছড়ায় ভবিষ্যতের বিয়ের বাজারে। অবশ্য এমন কোনো বদনাম নেই যেটা আস্তে আস্তে মুছে ফেলা যায় না। এবং কোনো কোনো স্থলে একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয় 'ফাম্ ফাতাল্' (fatal woman), 'বিপজ্জনক রমণী'র প্রতি।'

ইনি তাঁদেরই একজন কি-না সেটা জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে তার কন্যাক্ শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে গুটিতিনেক তরুণী একসঙ্গে ওয়েটারকে ডাকলে। যুবতী রাজ-রাজেশ্বরীর মত বাঁ হাতখানা দিয়ে যেন বাতাসের একাংশ দু'টুকরো করে অসম্মতি জানালেন, বললেন, 'সুইট্ অব্ ইউ, কিন্তু জানো তো আমার সোনার খনিতে এখন ডবল শিফ্‌টে কাজ চলছে। দ্বিতীয় শিফ্‌টায় আমি অবশ্য অনেকখানি সাহায্য করি। এমনিতেই আমি এক গাদা টাকার কুমিরকে চিনতুম, এখন আমার 'মারী' (স্বামী) প্রতি রাত্রেই দু-একটি নয়া নয়া বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছেন আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।—তোমরা বরঞ্চ শ্যামপেন খাও।'

তরুণীদের একাধিক জন আনমনা হয়ে ভাবলে তাদের জীবনে এ সুদিন আসবে কবে?

হঠাৎ যেন বিজয়িনীর একটি গভীর তত্ত্বকথা মনে পড়লো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু, যাদুরা, একটি কথা মনের ভিতর ভালো করে গেঁথে নিয়ো। ব্লুম এটা বলেন নি। সর্বপ্রেমের চরম গতি যখন পতিলাভ তখন সে-পথে নামবার আগে একটি মোক্ষম তত্ত্ব ভুললে চলবে না। ব্লুম বলেছেন, প্রথম ইদিক-উদিক প্রেম এবং ফ্যাকট্‌স অব্ লাইফ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, ইংরিজিতে পুরুষের বেলা যাকে বলা হয় 'বুনো ভুট্টা বপন'—সেইটে হয়ে গেলে পর বিয়ে করবে। তা হলে একের অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা হবে অনেক বেশি, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে অনেক বেশি—দাম্পত্য জীবন তাই হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও মধুর। ব্লুমের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ এ-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি তো নিশ্চয়ই করবো না, কারণ তিনি অতিশয় নীতি-বাগীশ—'

কোরাস উঠলো তাবৎ তরুণী কণ্ঠে, 'কি বললেন, মাদাম?'

কণামাত্র বিচলিত না হয়ে মহিলাটি ধীরে সুস্থে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, 'কট্টর নীতিবাগীশ, ধর্মভীরু, আচারনিষ্ঠ এবং ছিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যহীন ফরাসীসমাজকে নৈতিক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র। তিনি ইহুদি, এবং অনেকেই যে রকম তাঁর ইহুদি-ভ্রাতা ফ্রয়েট্‌কে ভুল বোঝে, এঁর বেলাও তাই হয়েছে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং জানি তিনি নীতি, মরালিটিতে অতিশয় আস্থাবান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন নীতি পরিবর্তন করে—বরং বলবো সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী ও কল্যাণময়ী করে সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য নবীন নীতির প্রয়োজন। তিনি সেইটে প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু এই নবীন নীতি প্রবর্তন

করতে পারি শুধু আমরা ফরাসীরাই। যেরকম আমরাই সর্বপ্রথম ফরাসীবিদ্রোহ করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করি। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি জর্মনিরও লাগবে এ নীতি গ্রহণ করতে অন্তত একশ বছর। তারা তো এখনো গণতন্ত্রটাই রপ্ত করতে পারেনি। আর যেসব দেশ ধর্ম উৎপাদন করেছে—যেমন প্যালেস্টাইন, আরবদেশ, ইণ্ডিয়া, এরা এ নীতি কখনো গ্রহণ করতে পারবে না, আর যদি করে তবে তাদের সর্বনাশ হবে।'

আমি মনে মনে সম্পূর্ণ সায় দিলুম। এবং যোগ দিলুম, হয়তো চীন পারবে।

'কিন্তু একটা প্র্যাকটিকাল উপদেশ আমি দিই। বিয়ের পূর্বের সর্ব অভিজ্ঞতা যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে হয়। তার প্রথম কারণ তারা প্রবীণতর, পক্কতর। তাদের কাছে শুধু প্রণয় নয়, জীবনের মূল্যবান আরো অনেক-কিছু শেখা যায়। কিন্তু খবরদার, আহাম্মুকের মত কক্‌খনো তাকে বলবে না, তোমার বউকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করো। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ইঁদুরকে আকাট মূর্খও বিয়ে করে না।

আরেকটা কারণ বললে তোমাদের তরুণ-হৃদয়ে হয়তো একটু বাজবে।

ঐ বিবাহিতদেরই দু'পয়সা রেস্ত থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর সেফ হাওয়া খেয়ে খেয়ে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয় না। সেটা হয় জনসমাজে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, অপ্‌রা, জুয়োর কাসিনো, রেস্‌, রিভিয়েরা-সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ, এগুলো না করলে, না চষলে কোনো এলেমই হয় না, যেটা তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী ও দাম্পত্য-জীবনে কাজে লাগবে।

আরেকটা সুবিধে, বলা তো যায় না, তিনি যদি মাত্রা সামলাতে না পেরে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন, তুমি তখন অতিশয় ব্রীড়া সহকারে বলতে পারবে, "আমি চাই নে যে আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আপনি একটি পরিবার নষ্ট করুন।"

এবং শেষ সুবিধে, যেদিন তুমি কেটে পড়তে চাইবে, সেদিন স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, "আমারও তো সংসার পাততে হবে, আমারও তো সমাজের প্রটেকশন দরকার", তারপর ব্লাশ করে বলবে, "আমিও তো, আমিও তো মা হতে চাই"।'

কি বলবো পাঠক, সে যা অনবদ্য অভিনয় করলেন সেই বিবাহিতা যুবতীটি—আহা, যেন ষোল বছরের তরুণীটি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ধন্য নটরানী প্যারিস, ধন্য তোমার অভিনয়, ধন্য তোমার নব মরালিটি! সাধে কি

লোকে বার বার বলে, 'সী প্যারিস এ্যাণ্ড ডাই'। প্যারিস দেখার পর পৃথিবীতে দেখবার মত আর তো কিছু থাকে না।

তবে আমার অনুরোধ, অন্যান্য বহু বস্তু নির্মাণ করার সময় ফ্রান্সে আইনত যেমন ছাপ মারতে হয়, 'নট্ ফর্ এক্স্পোর্ট'—'বিদেশে চালান নিষিদ্ধ', এই নব মরালিটির উপরও যেন তেমনি ছাপটি সযত্নে মারা হয়।

তবে আমি এটি আমদানি করলুম কেন? বুঝিয়ে বলি। বিদগ্ধা যুবতীটি যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলেন আমি তার সহস্রাংশের একাংশও বলি নি। আমি শুধু সেটুকুই বলেছি, যেটুকু আপনার জানা থাকলে যদি কখনো প্যারিসের ঐ নব মরালিটিটি এদেশে চোরাবাজার দিয়ে বা স্মাগল্ড্ হয়ে চলে আসে তবে যেন তৎক্ষণাৎ সেটি চিনতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন এই কর্মটি করেছিলেন। অনেকেই তার 'মঁসিয়ো ভেরুদু' ছবি দেখেছেন। চ্যাপলিনের পূর্বেও তার সময়ে ইয়োরোপের কোনো কোনো দার্শনিক সাড়ম্বর প্রচার করেন, জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেন সর্বাস্ত্র প্রয়োগ করে সর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'অর দ্য কঁবা'—দরকার হলে খতম করে দেয়। সেই হাস্যাস্পদ দর্শনের বেকুব চরম পরিণতি প্রমাণ করার জন্য চ্যাপলিন দেখান কি-ভাবে একজন লোক একটার পর একটা ধনী প্রাপ্তবয়স্কা রমণীকে বিয়ে করে তাকে সুকৌশলে খুন করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু খুনের কৌশলটি ছবিতে দেখান নি।

আমিও বিদগ্ধা প্যারিসিনীর আসল অস্ত্রটির রহস্য সযত্নে গোপন রেখেছি।

মদ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা

মদ্যপান ভালো না মন্দ সে নিয়ে ইয়োরোপে কখনো কোনো আলোচনা হয় না—যেমন তাস খেলা ভালো না মন্দ সে-নিয়েও কোনো তর্কাতর্কি হয় না। কিন্তু এ-কথা সবাই স্বীকার করেন যে মাত্রাধিক মদ্যপান গর্হিত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক—যে রকম তাস খেলাতে মাত্রাধিক বাজী রেখে, অর্থাৎ সেটাকে নিছক জুয়ো খেলায় পরিণত করে সর্বস্ব খুইয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অনুচিত।

এ দুটো ব্যসন যে আমি একসঙ্গে উত্থাপন করলুম সেটা কিছু এলোপাতাড়ি নয়। কুরান শরীফে এ-দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দুটির উৎপত্তি-স্থল স্বয়ং শয়তান। তৎসত্ত্বেও ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের একখানি দৈনিকে আলোচনা হচ্ছে, মাত্রা মেনে, অতিশয় সাবধানে কিংবা স্বাস্থ্যলাভের

জন্য সামান্য মদ্যপান করা শাস্ত্রসম্মত কিনা ? এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনার জন্য যতখানি মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞান থাকা উচিত আমার সেটি নেই। এবং শাস্ত্র ছাড়া লোকাচার, দেশাচার নামক প্রতিষ্ঠান আছে। উভয় বাঙলার এই দুটি আচারে মদ্যপান নিন্দিত। বরঞ্চ পশ্চিম বাঙলার কোনো কোনো জায়গায় তাড়ির প্রচলন আছে—পূব বাঙলায় সেটাও নেই, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি।

মোদ্দা কথা এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত সমাজে মদ্যপান নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটা নীতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে, এ্যাজ এ প্রিন্সিপল। অর্থাৎ হিন্দুর কাছে গোমাংস যেমন আত্যন্তিক ভাবে বর্জনীয়—অতি সামান্য অংশ খাওয়াও মহাপাপ—মুসলমানের কাছে শূকর মাংসও সেইরূপ। তাই এদেশে মদ্যপান ঠিক সেই রকমই বর্জন করতে হবে কি না সেই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে ওঠে।

ইতিমধ্যে ঔষধের মাধ্যমে অনেকেই সেটা প্রতিদিন পান করছেন—জানা-অজানায়। বেশীর ভাগ টনিকেই পনেরো, সতেরো পার্সেণ্ট এলকহল থাকে। একটি তরুণ এলকহলের তত্ত্ব না জেনে আমাকে এক বোতল টনিক দিয়ে বললে, 'অত্যুৎকৃষ্ট টনিক, স্যর! খাওয়ার সঙ্গেই মাথাটা চিম চিম করে, শরীরে বেশ ফুর্তির উদয় হয়।' আমি মনে মনে বললুম, 'বটে! ফুর্তিটা টনিকে ওষুধ থেকে না ঐ ১৭ পার্সেণ্ট মদ থেকে সেটা তো জানো না বৎস! অর্থাৎ পুচ্ছটি উত্তোলন করে—ইত্যাদি। কারণ টনিক বর্জিত ১৭ পার্সেণ্ট এলকহল সমন্বিত যে-কোনো মদ্য পান করলেই মাথাটা চিম চিম করে শরীরে বেশ ফুর্তির উদয় হয়।'

ভলতেয়ারের একটি 'আপ্তবাক্য' এত বেশী সুস্বাদ, এত বেশীবার মনে পড়ে যে সেটা আবার বললে পাঠক যেন বিরক্ত না হন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যখন অতি সামান্য কিছুটা ইউরোপে পৌঁচেছে তখন এক শ্রেণীর কুসংস্কারবাদী বলতে আরম্ভ করলো, ভারতবাসীরা মন্ত্রের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ঐ সময় এদেরই একজন ভলতেয়ারকে শুধোয়, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মেরে ফেলা যায় কিনা ?' ভলতেয়ার একটু বাঁকা হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে যাতে কোন গোলমাল না হয় তার জন্য আগের থেকে পালটাকে বেশ করে সেঁকো খাইয়ে দিয়ো।'

এই হচ্ছে আসল তত্ত্ব কথা—সেঁকোটাই সত্য ; মন্ত্রটা থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

ঠিক তেমনি ঐ যে টনিকের কথা একটু আগে বললুম, তার ঐ ১৭ পার্সেণ্টটাই সত্য ; বাকি যে সব ওষুধ-বিষুধ আছে সেগুলো থাকলে ভাল—

ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি ছেলে বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রম করে যেটুকু শেখে সেইটেই সেঁকো, সেইটেই ১৭ পার্সেণ্ট এলকহল। তারই জোরে ছেলে পরীক্ষা পাস করে—আমরা মাস্টাররা ক্লাসে যা পড়াই সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত ; থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

এই যে দেশটা চলছে সেটা জনসাধারণের শুভ বা অশুভ বুদ্ধি দ্বারা—সরকার যেটা আছে, সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত। এবং আজকাল তো আকছারই সেই মন্ত্রোচ্চারণও ভুলে ভুলে ভর্তি। থাক্ আর না। বৃদ্ধ বয়সে জেলে গিয়ে শহীদ হতে চাই নে।

ইয়োরোপীয়রা টনিকের অবান্তর মন্ত্রোচ্চারণ অর্থাৎ ওষুধটা বাদ দিয়ে শুধু এলকহলটাই খায়, তবে ১৭ পার্সেণ্টের মত কড়া করে নয়। কেউ খায় স্টাউট, কেউ খায় পোর্ট।

প্রাচ্যে ইহুদি, ক্যাথলিক ও পার্সীদের ধর্মানুষ্ঠানেও কিঞ্চিৎ মদ্যের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের সকলেই অত্যধিক মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করে থাকেন।

গল্পচ্ছলে প্রচলিত আছে :

দ্বিপ্রহর রাত্রে এক ধার্মিক যুবক
নিদ্রা যায় ; ঐ তার একমাত্র শখ।
একমাত্র সুখ তার ঐ নিদ্রা বটে,
—পিতা তার বৃদ্ধ অতি, কখন কি ঘটে।
ভগিনীটি বড় হল, বিয়ে দেওয়া চাই
দিবারাত্রি খাটে, আহা, গোনে কড়ি পাই।
যৌবনেই লোলচর্ম হল অস্থি-সার
নিদ্রাতেই ভোলে তাই নির্দয় সংসার॥

আপনারা তো আর 'কেচ্ছা সাহিত্য' পড়েন না। হায়, আপনারা জানেন না, আপনারা কি নিধি হারালেন! 'বিদ্যাসুন্দর' পড়ে যখন আনন্দ পান, তখন কেচ্ছা সাহিত্যে নিশ্চয়ই পাবেন।

আমার নিজের বিশ্বাস কেচ্ছা সাহিত্যের অনুপ্রেরণাতেই বিদ্যাসুন্দরের সৃষ্টি। তা সে যাক।

এবারে কেচ্ছাটাই শুনুন :

এই কেচ্ছা শোনে যেবা এই কেচ্ছা পড়ে
উত্তম চাউল পাবে রেশনে না ল'ড়ে।
বারো আনা দরে পাবে কিলোর ইলিশ
সরিষার তেল পাবে না সয়ে গর্দিশ।
দেড়টি টাকায় কিলো শোনো পুণ্যবান
খুশীতে ভরপুর হবে জমীন আসমান ॥

এ সংসারে যে মেলা পাপ মেলা দুঃখ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো আসে কোথা থেকে? সেমিতি—অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলিম গুরুরা বলেন শয়তান মানুষকে কুপথে নিয়ে গিয়ে পাপ দুঃখের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় তিনটি ধর্মেরই বিশ্বাস পূর্বজন্মের অর্জিত পাপপুণ্যের দরুন এ জন্মেও সুখদুঃখ দেখা দেয়—কাজেই হিন্দুধর্মে শয়তানের প্রয়োজন নেই। একদা কিন্তু এই হিন্দু ধর্মেও শয়তান জাতীয় একটি অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়ে উপযুক্ত প্র্যাকটিসের অভাবে লোপ পায়।

নল দময়ন্তীর উপাখ্যান যদিও মহাভারতে স্থান পেয়েছে তবু আমার বিশ্বাস মূল গল্পটি বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস চোঙা বা নলের ভিতর করে আগুন চুরি করেন; নলরাজও ইন্ধন প্রজ্বলনে সুচতুর ছিলেন। স্বয়ং দেবতারা প্রমিথিয়ুসের শত্রুতা করেন। নলের শত্রুতা করে স্বয়ং দেবতারা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে উপস্থিত হন—নলকে তাঁর বল্লভা থেকে বঞ্চিত করার জন্যে।

এই নলের শরীরে পাপ কলিরূপে প্রবেশ করেন। এই কলিই আর্যধর্মে শয়তানের অপজিট নাম্বার। মনে করুন সেই শয়তান বা কলি ঐ নিদ্রিত যুবকটির সামনে দিল দেখা:

হঠাৎ দেখিল মর্দ সম্মুখে শয়তান
নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গে হৈল খানখান।
শয়তানের হাতে হেরে ভীষণ তরবার
আকাশ-পাতাল জুড়ে ফলাটা বিস্তার।
ত্রিনয়ন, কণ্ঠে তার নৃমুণ্ডের মালা
জিহ্বা তার রক্তময় যেন অগ্নি ঢালা।

ইটি আসলে কথকতা। অতএব তাবৎ বক্তব্য ছন্দে দিলে রসভঙ্গ হয়।

যুবক বেতস পত্রের ন্যায় কম্প্রমান।

শয়তান হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'আজ থেকে স্বর্গ-মর্ত্য আমার পরিপূর্ণ দখলে এসেছে। তোকে আমি এই তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করবো। তার পূর্বে

আমার স্তব গেয়ে নে।'

যুবা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমার মরতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি মরে গেলে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে কে অন্ন আহরণ করবে? আমাকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।'

শয়তান ক্ষণতরে চিন্তা করে বললে, 'তোমাকে ছাড়তে পারি এক শর্তে। তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো। তাহলে তোমার সমস্যাও সমাধান হয়!' শয়তান অট্টহাস্য করে উঠলো।

পুত্র আর্ত ক্রন্দন করে বললে, 'অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পিতা মোরে জন্ম দিল বাল্যেতে আরাম
কেমনে হইব আমি নেমকহারাম!'

'নেমকহারাম' শুনে শয়তানের ক্রোধ চরমে পৌঁচেছে। কারণ সে একদা আল্লার সঙ্গে নেমকহারামী করেছিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে—'হিত' অবশ্য শয়তানের ধারণা অনুযায়ী যেটা হিত—বললে, 'তা হলে তুমি তোমার ভগিনীকে ধর্ষণ করো।'

যুবা এবারে আর কোনো উত্তর দিল না। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু শয়তানের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হবে কেন? সে চায় যুবাকে দিয়ে পাপ করাতে। তাই অন্য ট্যাকটিক অবলম্বন করে বললে, 'তোমাকে শেষ মুক্তির উপায় দিচ্ছি। এই নাও, এক পাত্র মদ্য পান করো।'

যুবা ভাবে:

মদ্য পান মহা পাপ সর্ব শাস্ত্রে কয়
এ পাপ করিলে গতি নরকে নিশ্চয়।
যাইব নরকে আমি নাহি কোনো ডর
শয়তানের শর্ত হীন, পাপিষ্ঠ, বর্বর।

অনিচ্ছায় সে করলে মদ্য পান। তারপর কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত।

মদ্যপান করে পরিপূর্ণ মত্তাবস্থায় পাপপুণ্যজ্ঞানহীন যুবা শয়তানের ঐ 'হীন পাপিষ্ঠ বর্বর' কর্ম দুটি করে ফেলল।

কাহিনীটি সর্বত্র বলা চলে না। কিন্তু যে মহাজন এটির কল্পনা করেন তিনি স্পষ্টত কাউকে ছেড়ে কথা বলতে চান নি, কোনো পাপ স্পেয়ার করতে চান নি। পৈশাচিক বীভৎস রস সৃষ্টি করে সর্ব মানবের হৃৎকন্দরে ভগবানের ভয় প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন।

এ তো গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষ কি বলেন, তার অনুসন্ধান আমি বহুকাল ধরে করে আসছি। কারণ আরব তথা অন্যান্য প্রাচ্যভূমিতে এ তথ্য সর্ববাদি-সম্মত যে, হেন কাহিনী এ পৃথিবীতে নেই যার বিপরীত গাথাও নির্মিত হয় নি। সেটিও পেয়েছি।

কিছুকাল পূর্বে টুরিজ্‌ম্‌-প্রসার সংস্থার আমি সদস্য হয়ে যাই—আমার একমাত্র 'গুণ' যে, কোন দেশই আমাকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারে না বলে আমি সে-দেশ থেকে সংক্ষেপে বিতাড়িত হই, ফলে আমার বহু দেশবাস, বহু দেশদর্শন হয়। এসব দেশের দেওয়ানি আদালতে দেউলেদের যে লিস্ট টাঙানো থাকে তার প্রত্যেকটিতে আমার নাম পাবেন। যদি কোনোটিতে না পান তবে বুঝে নেবেন সে দেশে আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলুম। বস্তুত আমি কোনো দেশের, কি স্বদেশের কি বিদেশের, কারো কাছে অঋণী থেকে মরতে চাই নে।

সেই টুরিজ্‌ম্‌ সংস্থার এক মিটিংএ জনৈক সজ্জন সভারম্ভেই বলেন, 'ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাগণ, কর্মসূচী আরম্ভ করার পূর্বেই আমার একটি বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রবাদ আছে, মুর্গী-ঘরে যদি শ্যাল ঢুকতে দাও, তবে সকালবেলার মম্‌লেটটির আশা ত্যাগ করেই ক'রো। তাই যদি দেশ থেকে মদ্যপান একদম ঝেঁটিয়ে বের করে দাও, তবে ইয়োরোপীয় টুরিস্টের আশা করো না; সে মম্‌লেটটি আমাদের প্লেট থেকে অন্তর্ধান করবে। অতএব, আপনারা এবং আপনাদের সরকার স্থির করুন, আপনারা টুরিজ্‌ম্‌ চান, না দেশকে মদ্যহীন করতে চান। আমার কাছে দুই-ই বরাবর।'

ভারী স্পষ্ট বক্তা। ওদিকে মুরুব্বীদের অনেকেই গান্ধীটুপি পরিহিত। এটাও চান ওটাও চান, কিন্তু কি করে উলঙ্গ ভাষায় বলেন, মদটা না হয় থাক। ওঁদের মতলব, এমন এক অভিনব কৌশল বের করা, যার প্রসাদে আণ্ডা না ভেঙেও মমলেট বানানো যায়! অতএব এসব ক্ষেত্রে যা উইদাউট ফেল্‌ করা হয় তাই সাব্যস্ত হল। পোস্টপোন করো।

মিটিঙের শেষে আমাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আমি শঙ্কিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। সরকারী পয়সায় লাঞ্চকে আমি লাঞ্ছনা নাম দিয়েছিলুম। ওদের ডিনারকে অনেকে সাপার বলতেন। আমি বলতুম suffer: সংক্ষেপে দুপুরে লাঞ্ছনা, রাত্রে suffer.

আমার অবস্থা দেখে সেই স্পষ্টভাষী বক্তা আমাকে সন্তর্পণে গাধা-বোটের মত টেনে টেনে করিডরে বের করে দে ছুট—ভদ্রতা বাঁচিয়ে। সেই হোটেলেই

তাঁর কামরা ছিল। সেখানে বসে আমার হাতে মেনু এগিয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট আহারাদি এল। তার পূর্বে জিন এল, বিয়ার এল। তিনি খেলেন সামান্যই।

বললেন, 'যত সব আদিখ্যেতা। কোনো জিনিসে একটা ক্লিয়ার পলিসি নেই। বিশ্বসুদ্ধু লোক মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিক, এটা কেউই চায় না। ফ্রান্সের মত এলকহলিজম একটা সমস্যারূপে দেখা দিক, সেটাও কেউ চায় না। অথচ ইংরেজ—তথা তাবৎ ইয়োরোপীয়রা—বিজনেস পাকাপাকি করে দুপুর বেলা 'বারে' দাঁড়িয়ে।'

আমাকে বললেন, 'শুনেছি আপনি সাহিত্যিক। একটা ঐ মতীফের (ধরনের) গল্প শুনবেন?'

আমি বললুম 'আলবৎ, একশ বার।'

'হরপার্বতী সাইকল্ জানেন?' অর্থাৎ তাঁদের নিয়ে জনসাধারণের গল্প? তারা যে একে অন্যের সঙ্গে বাজী ধরেন?

এটা তারই একটা।

হরপার্বতী শূন্যমার্গে উড়ে যাচ্ছেন। আকাশ থেকে দেখতে পেলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নান করছে। পার্বতী তাই দেখে মৃদু হাস্য করলেন।

শিব বললেন, 'কি হল?'

পার্বতী খিলখিল করে হেসে বললেন, 'এবারে তোমার নরকের পথ বন্ধ হল। বিষ্ণু বহুকাল ধরে যমের ঐ পশ্চিমের বাড়িটা চাইছিলেন সেটা পেয়ে যাবেন। বেচারী যম! জানো, যমের সহোদর উকিল ডাক্তারদের পসার কমে গেলে তাদের কি অবস্থা হয়?'

'পসার কমবে কেন?' শিব শিবনেত্র হয়ে শুধোলেন।

কৌতুকে হাসিলা উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া হর পানে। বললেন, 'কে আর যাবে নরকে? দেখছ না, তামাম দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে গঙ্গাস্নান করছে। সবাই হবে নিষ্পাপ। নরকে যাবে কে? তোমাকে বলি নি পই পই করে ঐ গঙ্গাটাকে তাড়াও।' আমার হোস্টটি গল্প থামিয়ে শুধালেন, 'জানেন বোধহয়, গঙ্গা হলেন পার্বতীর সতীন!'

'গঙ্গা তরঙ্গিনী, শিবের শিরোমণি।'

হোস্ট বললেন, 'শিব এই গঙ্গাস্নানের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন,—কিন্তু তার পূর্বেই

'হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল থাক্ পশুপতি।

যমের রাজত্ব যাবে এইটুকু জানি
অমৃত-রেশন্-শপও স্বর্গ নেবে মানি।
ভেজাল না হয় শুরু এই লাগে ভয়
স্বর্গের হাউসিং লাগি চিন্ত মহাশয়।'

থুড়ি! আর কথকতা নয়। আমার হোস্ট এ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি।

শিব কল্কেটা রথের স্টারগার্ড-এ (আকাশে মাড্-এর পরিবর্তে আকছারই নক্ষত্র চূর্ণ উড়ে এসে রথটা ধূলিময় করে বলে ওটা স্টারগার্ড) কল্কেটা ঠুকে ঠুকে সাফ করতে করতে বললেন, 'কিচ্ছু ভয় নাই, ডার্লিং। যারা স্নান করছে তারা এর পুণ্যফলে বিশ্বাস করে না।'

পার্বতী তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কী! তাবৎ পুরাণে যে পষ্ট লেখা রয়েছে। এখন তো ছাপাও হচ্ছে, বেতারেও প্রচার হয়, যে-পণ্ডিত নেহরু—'

শিব তখনো ইণ্ডিয়ার উপরে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করো আমি প্রমাণ করতে পারি।'

যথারীতি দু'জনাতে বাজী ধরা হল—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ভিতর শিব প্রমাণ করবেন, গঙ্গাস্নান যারা করে তারা মা-গঙ্গার কল্যাণে নিষ্পাপ হল বলে বিশ্বাস করে না।

অতি প্রত্যুষে বাজীর চুক্তিমত পার্বতী রাজরাজেশ্বরীর মহিমাময় সজ্জা পরে কিন্তু অতিশয় বিষণ্ণ বদনে বসলেন গঙ্গাতীরে। আর তাঁর কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন শিবঠাকুর—তাঁর সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ!

গঙ্গাস্নান সেরে উঠে এ দৃশ্য দেখে প্রথম ব্রাহ্মণ অবাক। কৌতূহল দমন না করতে পেরে দরদী কণ্ঠে শুধালো, 'মা, এ কি ব্যাপার!'

নিখুঁত ক্ষুদ্র দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে উষ্ণতম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্বতী বললেন, 'বাবা, আমার কপাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার স্বামীর অবস্থা। তবে ভগবানের দয়ায় এক গণৎকারের সঙ্গে দেখা। সে তাঁর হাত দেখে বলেছে, কোন নিষ্পাপ পুরুষ তাঁকে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

ব্রাহ্মণ কাঁচুমাচু হয়ে 'হ্যাঁ মা, তা মা', বলে বাং মাছটির মত মোচড় মেরে হাওয়া।

পার্বতী তো বজ্রাহত। লোকটা এইমাত্র গঙ্গাস্নান করে নিষ্পাপ হয়ে মা গঙ্গার কোল থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখেও দয়ামায়ার চিহ্ন। তবে কি—তবে কি গঙ্গাস্নানে তার বিশ্বাস—! শিব মৃদু হাস্য করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আরেক স্নান-সমাপ্ত দ্বিজ। কথোপকথন পূর্ববৎ। বাং

মাছের মোচড়টিও তদ্বৎ। পার্বতী দিশেহারা। ভোলানাথ আস্তদেশ বিস্তীর্ণ করলেন।

চললো যেন প্রশেসন। পার্বতীর গলা থেকে একই রেকর্ড বেজে চললো। ফল একই। ধূর্জটি গণ্ডা দুই হাই তুলে পদ্মনাভ স্মরণে এনে ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবসমাজে এই হলো ঘুমের বড়ি সনেরিল্।

করে করে বেলা দ্বিপ্রহর। ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল থেমে গেছে, জনপদবাট পান্থহীন। গঙ্গাতীরও ভূতনাথের শ্মশানসম নির্জন।

অপরাহ্ণ। পার্বতীর ক্লান্তি এসে গেছে। বললেন, 'নন্দীকে ডাকো, বাড়ি যাই। আমি হার মানলুম।'

শিব বললেন, 'সন্ধ্যা অবধি থাকার কথা। তাই হবে।'

এ তো কলকাতা নয় যে বাবুরা হাওয়া খেতে সন্ধেবেলা গঙ্গাতীরে আসবেন। কাগ-কোকিলও সেখানে আর নেই।

এমন সময় ক্ষীণ কনে দেখার মিলোয় মিলোয় আলোতে দূর থেকে দেখা গেল এক ইয়ার-গোছ নটবর। ডান হাত দিয়ে তুড়ি দিতে দিতে গান গাইছে, 'লে লে সাকী, ভর দে পেয়ালা।' বাঁ বগলে হাফ-পাট। বদনটি তার প্রফুল্ল। আপন মনে গান গাইতে গাইতে এদিক পানেই আসছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন গঙ্গাতীরে অপরূপ সুন্দরী দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। আপন মনে 'মাইরি' বলতে না বলতে হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মাতাল যে কখন আচম্বিতে অকারণ পুলকে নেচে ওঠে, আর কখন যে সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়—সেটা পাকা শুঁড়ির শুঁড়িও আগেভাগে বলতে পারে না। এবং মাতালের পুলক এবং কুণ্ঠা দুইই তখন পৌঁছয় চরমে, হাফাহাফি সন্ধিস্থলের বেনের পথই যদি সে নেবে তবে তো সে নর্মাল! বোতলে পয়সা বরবাদ করবে কেন?

মাতালের কৌতূহল হল। তদুপরি সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবুদ্ধিও জাগ্রত হল। মেয়েটাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। এই ভরসন্ধেবেলায়—

কুণ্ঠায় যেন আপন পাঞ্জাবির ভিতর মায় পা দুখানা, সর্বশরীর লুকিয়ে নিয়ে বললে, 'মা, এই অবেলায়, আপনি, এখানে, জানেন না, কি বলবো, কিন্তু কেন?'

পার্বতী মাতাল দেখে প্রথমটায় সঙ্কুচিত হয়ে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। মাতাল কিন্তু মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। কী আর করেন জগন্মাতা পার্বতী? আর বলাও তো যায় না, মাতাল! কখন রঙ বদলায়।

থেমে থেমে বললেন তাঁর হ্রস্ব কাহিনী হ্রস্বতর নির্যাসরূপে।

সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মুখে উৎসাহ আর আনন্দের দ্যুতি। হাসিও চাপতে পারে না।

কোন গতিকে বললে, 'হায় রে হায়, এই সামান্য বিষয় নিয়ে মা, তোমার দুর্ভাবনা! তুমি এক লহমা বসো তো মা শান্ত হয়ে।'

তারপর বললে, 'চতুর্দিকে কিন্তু চোর-চোট্টার পাল। হেঁ হেঁ—মা, কিছু মনে করো না, ঐ যে রইল বোতলটা তার উপর আধখানা চোখ রেখো।'

বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, 'এই মাঘের শীতের ভরসন্ধেবেলা চানটা না করিয়ে ছাড়লে না। মহামূল্যবান নেশাটাও মেরে যাবে দড়কচ্ছা। তা আর কি করা যায়!'

ঝপ্ করে গঙ্গায় এক ডুব মেরে উপরে উঠে খপ্ করে ধরলে শিবের ঠ্যাঙখানা।

বত্রিশ নয় যেন চৌষট্টিখানা দাঁত বের করে বললে, 'হল মা-জননী? এই সামান্য জিনিসটের জন্যে তুমি এতখানি ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলে? ছিঃ মা, তোমার বিশ্বাস বড় কম!'

মাঝ গাঙের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঐটে কি তোমাদের নৌকো? কে যেন ডাকছে? আমি তা হলে আসি। আমার আবার বেতো শরীর। পেন্নাম হই মা, বাবাজী সেরে তো উঠলো—এবারে একটু—ইয়ে মানে সাবধানে—।'

লাঞ্চ শেষ হয়ে এসেছে। সোফায় বসে সিগার ধরিয়ে হোস্ট বললেন, 'দেশ বোন্-ড্রাই হোক কিংবা উচ্ছন্নে যাক্—আমার কিচ্ছুটি বলার নেই। কিন্তু দু' একটা মাতাল না থাকলে ডেয়ারিং কাজ করবে কে?

আমারও নিজের কিচ্ছুটি বলার নেই। আমি দু'পক্ষেরই বক্তব্য নিবেদন করলুম মাত্র।

আমি পক্ষ নেবই বা কেন? এক পক্ষ বলছেন আমাকে ড্রাই করে ছাড়বেন, অন্য পক্ষ বলছেন, আমাকে ভিজিয়ে দেবেন। দু'পক্ষেই দারুণ লড়াই।

দুটো কুকুর যদি এক টুকরো হাড্ডি নিয়ে লড়াই করে, হাড্ডিটা তো তখন কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে লড়াই করে না!

শ্রীচরণেষু

কতকগুলো খেলা প্রায় সব দেশের ছেলেমেয়েরাই খেলে। যেমন মনে করো, কানামাছি কিংবা লুকোচুরি। আবার মনে করো সাঁতার কাটা ;—সাহারার মরুভূমিতে, কিংবা মনে করো খুব বড় শহরে, যেখানে নদী পুকুর নেই, সেখানে যে সাঁতার কাটাটা খুব চালু হতে পারে না, সেটা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জল আছে অথচ সাঁতার কাটাটা লোকে খুব পছন্দ করে না, তাও হয়। শীতকালে ইয়োরোপের সব নদী-পুকুর জমে বরফ হয়ে যায় না, তবু সেই পাথর-ফাটা শীতে কেউ পারতপক্ষে জলে নামতে চায় না—সাঁতারের তো কথাই ওঠে না।

খেলাধুলো তাই নির্ভর করে অনেকটা দেশের আবহাওয়ার উপর। কিছু না কিছু জল প্রায় সব দেশেই আছে, তাই কাগজ বা পাতার ভেলা সবাই জলে ভাসায়। কিন্তু যে দেশে ঝমাঝ্-ঝম্ বৃষ্টি নেমে আঙ্গিনা ভরে গিয়ে চতুর্দিকে জল থৈ-থৈ করে না, সে দেশের ছেলে-মেয়েরা আর দাওয়ায় বসে আঙ্গিনার পুকুরে কাগজের ভেলা ভাসাবে কি করে? অথচ ভেলা-ভাসানোর মত আনন্দ কম খেলাতেই আছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার কথা ভেবে গান রচেছেন :

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
পিছন পানে চাইনে ফিরে।

আর ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিশু ভোলানাথে'র এ-কবিতাটি তোমরা নিশ্চয় জানো :

দেখছ-না কি নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার?
সাত-সমুদ্র তেরো-নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইকো হরিশ খোঁড়া—
তাই ভাবি যে কাকে আমি
করব আমার ঘোড়া।
কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,

নৌকো দে-না বানিয়ে—অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লী থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত-সমুদ্র-তীরে।

ভারী চমৎকার কবিতা! কিন্তু বাকীটা আর বললুম না। যাদের পড়া নেই, তারা যেন 'শিশু ভোলানাথ'খানা খোলে, এই হচ্ছে আমার মতলব।

তা সে কথা যাক্। বলছিলুম কি, আবহাওয়ার উপর খেলাধুলো অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের দেশ জলে ভর্তি, বিশেষ করে পূব বাঙ্গলা, তাই আমাদের খেলাধুলো জমে ওঠে জলের ভিতরে বাইরে। তেমনি শীতের দেশে বরফ পড়ে বিস্তর, আর তাই নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলোর অন্ত থাকে না। 'ধুলো' বলা অবশ্যি ভুল হলো, কারণ বরফে যখন মাঠ-ঘাট, হাট-বাট সব কিছু ছেয়ে যায়, তখন তামাম দেশে এক রত্তি ধুলোর সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

কাবুলে যখন ছিলুম, তখন জানলা দিয়ে দেখতুম, ছেলেমেয়েরা সকাল থেকে পেঁজা বরফের গুঁড়ো হাতে নিয়ে ঢেলা পাকিয়ে একে ওকে ছুঁড়ে মারছে, সে ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চট করে সরে যাবার চেষ্টা করছে। যদি তাগমাফিক লেগে গেল তবে তুমি ওস্তাদ ছেলে, হাতের নিশান ভালো, হয়তো একদিন ভালো বোলার হতে পারবে। আর না লাগলেও তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না, কারণ ততক্ষণে হয়ত তোমার কানে এসে ধাঁই করে লেগেছে আর কারো ছুঁড়ে মারা গোলা। কানের ভিতর খানিকটা বরফের গুঁড়ো ঢুকে গিয়ে কানের ভিতরকার গরমে গলতে আরম্ভ করেছে। ভারী অস্বস্তি বোধ হয় তখন—মনে হয়—যেন কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তখন খেলা বন্ধ করে কান সাফ করার জন্য দাঁড়াতে হয়। আর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যিখানে ও রকম ধারা দাঁড়ানো মানেই আর পাঁচজনের তাগ হওয়া। মাথা নীচু করে যতক্ষণ তুমি কান সাফ করছো, ততক্ষণে এ-দিক, ও-দিক, চতুর্দিক থেকে গোটা দশেক গোলাও খেয়ে ফেলেছ।

তা বয়েই গেল। বরফের গোলা যত জোরেই গায়ে এসে লাগুক না কেন, তাতে করে চোট লাগে না। গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোলা চুরমার হয়ে যায়। কিছুটা বরফের গুঁড়ো অবশ্যি জামা-কাপড়ে লেগে থাকে। তা সেটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই হয়—না হলে গরম জামা কাপড়ের ওম লেগে খানিকক্ষণ বাদে বরফ গলে গিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দেবে।

বরফ জমলেই এ খেলা জমে উঠতো। আর আমি কাজকর্ম ধামাচাপা দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসতুম।

এ খেলায় সত্যিকার ওস্তাদ ছিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। খেলার মধ্যিখানে সে এমনি চর্কিবাজির মত ঘুরত যে তার গায়ে গোলা ছোঁড়ে কার সাধ্যি। আর আমাদের দেশের পাকা লেঠেলের মত সে একাই জন আষ্টেককে অনায়াসে কাবু করে ফেলত। ভারী মিষ্টি চেহারা, পাকা আপেলের মত টুকটুকে দু'টি গাল, নীল চোখ, আর সেই দু'চোখে যেন দুনিয়ার যত দুষ্টুমি বাসা বেঁধে বসে আছে। নাম ইউসুফ, পাশের বাড়িতে থাকে, আর তার বাপ আমাদের কলেজের কেরানী। আমাকে পথে পেলে সেলাম করে কিন্তু সসম্ভ্রম সেলামের সময়ও চোখের দিকে তাকালে মনে হত ছেলেটা কোনো এক নতুন দুষ্টুমির তালে আছে। যদি জিজ্ঞেস করতুম, 'কি রকম আছিস?' তাহ'লে এক গাল হেসে কি একটা বলত, যার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম কোনো একটা দুষ্টুমির সুযোগ পেলে সে আমাকেও ছাড়বে না।

সে-ই একদিন বাড়ি বয়ে এসে সোৎসাহে খবর দিয়ে গেল, আমি তাদের ইস্কুলে বদলি হয়ে এসেছি। তার চোখে মুখে হাসি আর খুশী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি তার চোখে যেটি লক্ষ্য করলুম সেটি হচ্ছে "এইবার আসুন স্যর, আপনাতে আমাতে এক হাত হয়ে যাবে।" আমি যে খুব ভয় পেলুম তা নয়, কারণ ছেলেবেলায় আমিও কম দুষ্টু ছিলাম না।

ওদের ইস্কুল বড় অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেদের ক্লাস ওয়ান থেকে আই-এ ক্লাসের ছেলেরা একই বাড়িতে পড়ে। তাই সেটাকে পাঠশালা বলতে পারো, হাইস্কুল বলতে পারো, আর কলেজ বললেও বাধবে না। আমি বদলি হলুম কলেজ বিভাগে—ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবার জন্য। এ দু' ক্লাস পড়িয়ে আমার হাতে মেলা সময় পড়ে থাকত বলে একদিন প্রিন্সিপাল অনুরোধ করলেন, আমি যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদেরও ইংরিজি পড়াই তবে বড় উপকার হয়। আমি খানিকটে ভেবে নিয়ে বললুম, তার চেয়ে আমাকে বরঞ্চ ক্লাস ওয়ানে পড়াতে দিন। আসছে বছর ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রোমোশন দেবেন—অর্থাৎ আমি টু'তে পড়াব, তার পরের বছর থ্রীতে। এই করে করে যাদের কলেজে টেনে নিয়ে আসতে পারব তাদের ইংরিজি জ্ঞান থেকে বুঝতে পারবো আমি ভালো পড়াতে পারি কি না। প্রিন্সিপাল তো কিছুতেই মানেন না; বলেন, 'সে কি কথা! আপনি পড়াবেন

ক্লাস ওয়ানে!' আমার প্রস্তাবটার তত্ত্ব বুঝতে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কাবুলী প্রিন্সিপালের বুদ্ধি—থাক, গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই।

ওদিকে ক্লাস ওয়ানে হৈ হৈ রৈ রৈ। কলেজ বিভাগের অধ্যাপক আসছেন ক্লাস ওয়ানে পড়াতে!

আমার তখন আদপেই মনে ছিল না ইউসুফ ক্লাস ওয়ানে পড়ে। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকতেই দেখি, সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। অনুমান করলুম, প্রতিবেশী হিসেবে সে আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানে সেটুকু সকলকে সগর্বে সদম্ভে জানিয়ে দিচ্ছে। আমার চাকর আবদুর রহমানের সঙ্গে ইউসুফের আলাপ পরিচয় ছিল। আর আবদুর রহমান ভাবতো তার মনিবের মাথায় একটুখানি ছিট আছে। আবদুর রহমান যদি সেই সুখবরটি ইউসুফকে দিয়ে থাকে, আর সে যদি ক্লাসের সবাইকে সেই কথাটি জানিয়ে দেয়, তবেই হয়েছে!

ক্লাসে মাস্টার ঢুকলেই কাবুলের ছেলেরা মিলিটারি কায়দায় সেল্যুট দেয়—আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ। আমি ক্লাসে ঢুকতেই ইউসুফ তড়াক করে সুপারি গাছের মত খাড়া হয়ে মিলিটারি সেল্যুটের হুকুম হাঁকল। তার পর খুশীতে ডগমগ হয়ে আপন সীটে গিয়ে বসল।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো। 'বাইরে যেতে পারি, স্যর?' আমি বললুম, 'যা, কিন্তু দেখ, আমি বাইরে যাওয়া-যাওয়ি জিনিসটা মোটেই পছন্দ করি নে। যাবি আর আসবি।' 'নিশ্চয় স্যর।' বলে আরেকটা মিলিটারি সেল্যুট ঠুকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট যেতে না যেতে ইউসুফ ফিরে এল। তাই তো, ছেলেটা তা হলে অতটা দুষ্টু নয়। কিন্তু আরো তিন মিনিট যেতে না যেতে আমার ভুল ভাঙ্গলো। ইউসুফের পাশের ছেলেটা পড়ার মাঝখানে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'স্যর, আমার পকেট ভিজে গিয়েছে,—এই ইউসুফটা আমার পকেটে বরফের ঢেলা রেখেছিল।' ইউসুফ আরো চেঁচিয়ে বলল, 'না স্যর, আমি রাখি নি।' ছেলেটা আরো চেঁচিয়ে বলল, 'আলবাৎ তুই রেখেছিস।'

ইউসুফ বলল, 'তোর ডান পকেট ভেজা, আমি তো বাঁ দিকে বসে আছি।' ছেলেটা বলল, 'তুই না হলে বরফ আনল কে? তুই তো এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়েছিলি।'

হট্টগোলের ভিতর আমি যে তাবৎ তর্কাতর্কি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম তা নয় কিন্তু কথা কাটাকাটিটা মোটের উপর এই রকম ধারায়ই চলেছিল। বিশেষ করে শেষের যুক্তিটা আমার মনের উপর বেশ জোর দাগ কাটল। ইউসুফ না

হলে বরফের ঢেলা আনল কে? আর বরফ তো আগের থেকে ঘরে এনে জমিয়ে রাখা যায় না—গলে যায়।

রাগের ভান করে কড়া হুকুম দিলুম, 'ইউসুফ, তুই বেঞ্চির উপর দাঁড়া।'

ইউসুফ বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তড়াক করে পলটনি কায়দায় বুট দিয়ে খটাস করে শব্দ করে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে ফের সেল্যুট দিল। পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ—ছোট ছেলেরা পর্যন্ত পলটনি জুতা পরে আর হুকুম তামিল করার সময় পলটনি সেল্যুট ঠোকে।

ভাবলুম, ইউসুফ আমাদের দেশের ছেলের মত 'বসি, স্যর?' বলে অনুনয় করবে। আদপেই না। চাঁদপানা মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষটায় আমিই হার মানলুম। বললুম, 'বস্। আর ও রকম করিস নে।' ইউসুফ আরেকবার সেল্যুট জানিয়ে বসে পড়ল।

বাড়ি ফেরার সময় বুঝতে পারলুম, সব দেশের খেলাধুলা যে রকম আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে, দুষ্টুমিটাও ঠিক সে রকম অনেকটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের ছেলেরা বরফের গুঁড়ো পাবে কোথায় যে তাই নিয়ে দুষ্টুমি করবে?

তারপর দু' তিন দিন ইউসুফ ঠাণ্ডা। ভাবলুম প্রথম দিনের সাজাতে হয়তো ইউসুফের আক্কেল হয়ে গিয়েছে। আর জ্বালাতন করবে না।

আমাদের দেশ গরম, তাই ঘরে ঘরে পাখার ব্যবস্থা থাকে। কাবুল ঠাণ্ডা, তাই সেখানে ক্লাসে ক্লাসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি ঘরভর্তি ধুঁয়ো, আর চিমনির আগুন নিভে গিয়েছে।

ছেলেরা কাশছে আর ইউসুফ পাতলুনের দুই পকেটে হাত পুরে অত্যন্ত বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। দেশে টানাপাখার দড়ি ছিঁড়ে গেলে যে রকম চাপরাসীর সন্ধানে ছেলে পাঠানো হয় আমি তেমনি বললাম, 'চাপরাসীকে ডাকো।' ইউসুফকে পাঠানো আমার মতলব ছিল না। কিন্তু সে চট করে 'এক্ষুনি ডাকছি স্যর' বলে হুট করে বেরিয়ে গেল। থামাবার ফুরসৎ পেলুম না।

মিনিট তিনেক পরে এলেন খুদ্ প্রিন্সিপাল। মুখে কেমন যেন একটু বিরক্তি। বললেন, 'আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' আমি তো অবাক!

'সে কি কথা! আমি আপনাকে ডেকে পাঠাবো কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই তো আপনার কাছে যেতে পারি। আমি তো ডেকে পাঠিয়েছি চাপরাসীকে, আগুন নিভে গিয়েছে বলে।' প্রিন্সিপালের মুখ থেকে

বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে দেখা গেল রাগ। ইউসুফের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে তুই আমাকে ডাকলি কেন?'

ইউসুফ তার ড্যাবড্যাবে চোখ হরিণের মত করুণ করে বলল, 'আমি তো শুনলুম, প্রিন্সিপাল সায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়। তা কি জানি ওঁর ফার্সী আমি ঠিক বুঝতে পারি নি হয়তো।' প্রিন্সিপাল ইউসুফকে দুই ধমক দিয়ে চলে গেলেন।

কি ঘড়েল ছেলে রে বাবা! আমি বিদেশী বলে যে খুব ভালো ফার্সী বলতে পারি নে তার পুরো সুযোগ নিয়ে সে আমাকে এক দফা বোকা বানিয়ে দিল।

ততক্ষণে চাপরাসী এসে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বলতে চায় না। ঘর আরো ধুঁয়োয় ভরে গিয়েছে। ছেলেরা কাশতে আরম্ভ করেছে, কারো কারো চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, আমার তো প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। চাপরাসী ততক্ষণে হার মেনে চলে গিয়েছে বুড়ো চাপরাসীর সন্ধানে —সে যদি কিছু করতে পারে। ইউসুফ বলল, 'স্যর, জানলাগুলো খুলে দিই?' আমি বললুম, 'দাও।' দম বন্ধ হয়ে তো আর মারা যেতে পারি নে।

এক মিনিটের হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দিল। পড়াবো কি, আর পড়বেই বা কে? আমাদের দেশে যে রকম ভয়ঙ্কর গরমের দিনে ক্লাসের পড়ার দিকে মন যায় না, কাবুলে তেমনি দারুণ শীতের মাঝখানে পড়াশোনা করা অসম্ভব। হাতের আঙুল জমে গিয়েছে, কলম ধরতে পারছি নে, বইয়ের পাতা ওল্টানো যায় না। ছেলেরা ততক্ষণে আবার আপন আপন দস্তানা পরে নিয়েছে—আর দস্তানা-পরা হাতে লেখা, পাতা ওল্টানো, এসব কাজ আদপেই করা যায় না।

ততক্ষণে বুড়ো চাপরাসী এসেও হার মেনেছে। কিন্তু লোকটা বিচক্ষণ। খানিকক্ষণ চেষ্টা দেওয়ার পর বলল, 'ধুঁয়ো উপরের দিকে না উঠে ঘর ভরে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ধুঁয়ো বেরোবার চোঙা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।'

তদারক করে দেখা গেল বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। চোঙার ভিতরে, উপরের দিকে হাত চালানোতে বেরিয়ে এল একটা ক্যানাস্তারার টিন, ছেঁড়া কম্বল দিয়ে জড়ানো। বোঝা গেল, বেশ যত্নের সঙ্গে, বুদ্ধি খরচ করে চোঙাটি বন্ধ করা হয়েছে, যাতে করে ধুঁয়ো উপরের দিকে না গিয়ে সমস্ত ক্লাস ভরে দেয়।

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'চোঙা বন্ধ করল কে?'

সমস্ত ক্লাস এক গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ। আর কে করতে যাবে?'

ইউসুফের দুশমন গোলাম রসুল বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকি তখন ইউসুফ ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

ইউসুফ বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন গোলাম রসুল ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

গোলাম রসুল চটে গিয়ে বলল, 'মিথ্যেবাদী!'

ইউসুফ মুরুব্বীর সুরে বলল, 'এই, স্যরের সামনে গালমন্দ করিস নে।'

কি জ্যাঠা ছেলে রে বাবা! বললুম, 'তুই এদিকে আয়।'

কুইক মার্চে সামনে এসে সেল্যুট দিল। আমি বললুম, 'তোকে ভালো রকমের সাজা দেওয়া উচিত। আজকে সমস্ত ক্লাসের পড়া নষ্ট করেছিস। ঢোক্ গিয়ে টেবিলের তলায়। চুপ করে সেখানে বসে থাকবি, আর কথাটি কয়েছিস কি তোর গলা কেটে ফেলব।'

সুড় সুড় করে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল।

কাবুলের ক্লাসে মাস্টার মশায়দের টেবিল বিলিতি কায়দায় বানানো হয়। অর্থাৎ তার তিন দিক ঢাকা। শুধু মাস্টার যে দিকে বসেন সেদিকটা খোলা। মনে করো খুব বড় একটা প্যাকিং কেসের ডালাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিল বানাও আর খোলা দিকটায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সটা দিয়ে টেবিলের কাজ চালাও। আমি ঠিক তেমনি ভাবে ব'সে, আর ইউসুফ চুপ্ করে ভিতরে। নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।

মনে হল ইউসুফের তা নিয়ে কোন খেদ নেই; কারণ পঞ্চাশ মিনিটের পিরিয়ডের প্রায় আধঘণ্টা সে ধুঁয়ো, প্রিন্সিপাল, আর চাপরাসী দিয়ে বরবাদ করে দেবার বিমলানন্দ আপন মনে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে।

আমি ছেলেদের পড়াতুম মুখে মুখে। চেঁচিয়ে বলতুম I go, সমস্ত ক্লাস আমার পরে বলত I go, আমি বলতুম We go, ক্লাস বলত We go, এ রকম ধারা you go, you go, কিন্তু Rahim goes, Karim goes, তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলতুম Rahim and Karim go-o-o-o।

ওদিকে ইউসুফ চুপচাপ। জিজ্ঞেস করলুম—'তুই বলছিস না কেন রে?' বাক্সের অথবা টেবিলের, যাই বলো—ভিতর থেকে ইউসুফের গলা শোনা গেল, 'ও তো আমি জানি।' আমি বললুম, 'বলে যা।' সে সমস্ত কনজুগেশনটা ভুল না করে গড় গড় করে আবৃত্তি করে গেল। হুঁ! ছেলেটা শয়তান বটে, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো।

ঘণ্টা পড়লো। বললুম, 'ইউসুফ বেরিয়ে আয়।' সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল। বললুম, 'বল্ আর কক্‌খোনো করবি নে।' কি যেন একটা বিড় বিড় করে বলল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ততক্ষণে ক্লাস ডিসমিস করে দিয়েছি বলে সে একটা ছোটাসে ছোটা সেল্যুট সেরে ডবল মার্চ করে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন বুঝতে পারলুম, দুষ্টুমি করবে না এ প্রতিজ্ঞা করতে সে নারাজ, তাই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছে।

রেজিস্টার, বই, খড়ি, ডাস্টার গুছিয়ে নিয়ে যেই দাঁড়াব বলে টেবিলের তলা থেকে পা টেনে আনতে গিয়েছি অমনি দু'পা-ই আটকা পড়ে গেল। কি ব্যাপার! ঘাড় নিচু করে দেখি, আমার দু'জুতোর দুই ফিতে একসঙ্গে বাঁধা।

কি করে হল? এ তো বড় তাজ্জব! অবশ্যি, বুঝতে সময় লাগল না। আমার অভ্যাস পা দু'খানি একজোড় করে বসার। ইউসুফ তারই সুবিধে নিয়ে অতি আস্তে আস্তে ফিতের গিঁঠ খুলে দু'ফিতে অর্থাৎ দুই জুতো একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! আর সে এমনি মোলায়েম কায়দায় যে, আমি কিছুই টের পাই নি!

আমি হার মানলুম।

বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে দেখি, বাড়ির দেউড়ির সামনে ইউসুফ আমার চাকর আব্দুর রহমানকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে, আর বিরাট-বপু আব্দুর রহমান সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে কুটিকুটি। আমাকে দেখেই ইউসুফ চট্‌পট্ চম্পট।

পরদিন কলেজ যাবার সময় আব্দুর রহমান জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'এক রকম বোতামওলা বুট ফিতেওলা জুতোর চেয়ে ভাল।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বস্ বস্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

পুচ্ছ (প্র) দর্শন

কুকুর মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে—এ-তথ্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু কুকুরের কাটা লেজের অবশিষ্ট চার আঙুল পরিমাণ একটা ছ' ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ানকে বাঁচিয়েছে—এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি এ ঘটনাটির বর্ণনা আমাকে দেন, তিনি অনেকের কাছেই সুপরিচিত এবং তাঁরা সকলেই সানন্দে শপথ করতে প্রস্তুত হবেন যে, শ্রীযুত বিনায়ক রাও শিবরাম মসোজীকে কেউ কখনো মিথ্যা-ভাষণ করতে শোনেন নি।

আমার শুধু ক্ষোভ যে, বিনায়ক রাও যখন আমাকে প্রাগুক্ত ঘটনার সঙ্গে

বিজড়িত তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বর্জন করে যান, তখন আমার সুদূর কল্পনাদৃষ্টি দিকচক্রবালে এতটুকু আভাস দেখতে পায় নি যে, আমার মত নগণ্যজনও একদিন বাঙলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবে ; নইলে সেদিন আমি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে বিনায়ক রাওয়ের ভ্রমণকাহিনীটি সবিস্তার লিখে রাখতুম। কারণ, আমাদের পরিচিত জন নিত্য নিত্য মানসসরোবর দর্শনে যায় না ; তাও পিঠে মাত্র একটি হ্যাভারস্যাক নিয়ে। পরবর্তী যুগে আমাকে এক মারাঠা দম্পতি বলেন যে, মানসরোবরে (না মানস সরোবরে তাই আমি জানি নে) যাবার পথে ডাকাতের ভয় আছে বলে তাঁরা সঙ্গে সেপাইশান্ত্রী নিয়ে যান।

বিনায়ক রাও শ্রীযুত নন্দলালের শিষ্য এবং শিক্ষাশেষে তিনি গুরু নন্দলালের সহকর্মীরূপে কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। নন্দলাল যেরকম দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, বিনায়ক রাও তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে ভারতীয় বাতাবরণে, ভারতীয় বেশভূষায় মাদন্না মা-মেরির একাধিক ছবি এঁকে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের মাদন্না দেখে দেখে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম যে, মা-মেরি প্যালেস্টাইন-বালা এবং প্যালেস্টাইন প্রাচ্যভূমি। বিনায়ক রাওয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাদন্না কিছুদিন পূর্বেও এলগিন রোডের একটি গির্জার শোভাবর্ধন করতো।

তিনি যে চিত্রকর ছিলেন, তার উল্লেখ করছি আমি অন্য কারণে। আর্টিস্ট মাত্রেরই অন্যতম প্রধান গুণ যে, তাঁরা কোনো বস্তু প্রাণী বা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো (ক্যারেকটারিস্টিক) লক্ষ্য করেন এবং ঠিক সেইগুলো মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে প্রকাশ করতেই আমাদের কাছে রূপায়িত বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সময় বিনায়ক রাও দৃশ্যের পর দৃশ্য মাত্র কয়েকটি ক্যারেকটারিস্টিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হিমালয়ের গিরি-পর্বত-তুষার-ঝঞ্ঝা চট্টি-কাফেলা সব যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতুম। সেটা এখানে এখন আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব কারণ আমি কোনো অর্থেই আর্টিস্ট নই।

বিনায়ক রাওয়ের গভীর বন্ধুত্ব ছিল এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে—নাম খুব সম্ভব ছিল—এতকাল পরে আমার সঠিক মনে নেই—হাসেগাওয়া। পাঁচ ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য হয় কি না হয়, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি পেশী ছিল যেন ইস্পাতের স্প্রিং দিয়ে তৈরি। প্রায় কিছু না খেয়েই কাটাতে পারতেন দিনের পর দিন এবং বীরভূমের ১১০ ডিগ্রীতেও তাঁর মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা যেত না। বিনায়ক রাওয়ের সঙ্গে তাঁর আরেকটা বিষয়ে ছিল হুবহু মিল, দুজনাই

অত্যন্ত স্বল্পভাষী। হাসেগাওয়াই প্রস্তাব করেন মানসসরোবরে যাওয়ার।

আমার আজ মনে নেই, কোন্ এক সীমান্তে গিয়ে ঐ পুণ্যসরোবরে যাবার জন্য পারমিট নিতে হয়। বিনায়ক রাও আমাকে বললেন, 'সব সরকারই বিদেশীদের ডরায়, ভাবে ওরা গুপ্তচর, কি মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে। ওসব জায়গায় তো যায় মাত্র দু'ধরনের লোক। তীর্থযাত্রী, আর যেটুকু সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারবারী লোক—এরা যায় ক্যারাভান বা কাফেলার দল বানিয়ে। আমি খৃষ্টান, হাসেগাওয়া বৌদ্ধ; মানসসরোবর আমাদের কারোরই তীর্থ হতে পারে না। তবু ফর্মে লিখে দিলুম তীর্থযাত্রী, নইলে পারমিট অসম্ভব। হাসেগাওয়া বললেন, "আমরা গা-ঢাকা দিয়ে রইব, যতদিন না পারমিট পাই, পাছে আমাদের স্বরূপ না ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে তোমাকে মাউণ্টেনীয়ারিং বা পাহাড় চড়ার আর্টে তালিম দেব।" ' বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি তো মনে মনে হাসলুম। হাসেগাওয়ার তুলনায় আমি তো রীতিমত পাগলওয়ান। আমি পাহাড় চড়ি চড়্ চড়্ করে—ও আবার আমায় শেখাবে কি? কিন্তু ভুল ভাঙল প্রথম দিনই। পাশেই ছিল একটা ছোটখাটো পাহাড়। সেইটে দিয়েই হল আমার প্র্যাকটিস শুরু। হাসেগাওয়া আমাকে পই পই করে বার বার বললেন, "কনে-বউটির মত চলি চলি পা পা করে ওঠো, নইলে আখেরে পস্তাবে।" আমি মনে মনে বললুম, দুত্তোর তোর পা পা। চড় চড় করে উঠতে লাগলুম চড়াই বেয়ে—বাঘের শব্দ পেলে বাঁদর যে-ধরনে সোঁদরবনে সুন্দরী গাছ চড়ে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মশাই, ঘণ্টাদুই পরে দেখি অবস্থা সঙ্গীন। আর যে এক কদমও পা চলে না। ভিরমি যাবার উপক্রম। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আমি বসে পড়লুম একটা পাথরের উপর। ঘণ্টাটাক পরে হাসেগাওয়া আমাকে পাস্ করলেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে। তিনি চূড়ায় উঠলেন। আমি বসে বসে দেখলুম। নেমে এলেন। বিশ্বাস করবেন না, সৈয়দসাহেব, আমার আত্মাভিমানে লাগল জোর চোট।'

আমি বললুম, 'দাক্ষিণাত্যের তীরু আন্নামলাইয়ের রমন মহর্ষির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি অরুণাচলম পাহাড়ের উপর কাটান চল্লিশ না পঞ্চাশ বছর কিংবা ততোধিক। পাহাড়টা কিছু মারাত্মক উঁচু নয় কিন্তু ঝড়ে-বাদলায়, গরমে-ঠাণ্ডায়, কখনো বা অত্যন্ত অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে দিনে অন্তত একবার করে ওঠানামা করতে হত। এক পুণ্যশীলা গ্রামের মেয়ে তাঁর জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতো পাহাড়ের তলায়, যেখানে আজকের দিনের আশ্রম। তিনিও আমাদের ঐ চলি চলি পা পা-র উপদেশ দিয়েছেন, খুব ভালো

ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে। তারপর বলো।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পরদিন আরেকটা পাহাড়ে চেষ্টা দিলুম। সব জেনে-শুনেও আমার কিন্তু ঐ কনে-চাল কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না। আর হাসেগাওয়া প্রতিদিন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পাস্ করতেন ও জিততেন লজ্জাকর মার্জিন রেখে।

'আমরা দিনের পর দিন প্রহর গুনছি—পারমিট আর আসে না, ওদিকে আমরা জনমানবহীন পাহাড়গুলো চড়ছি আর ভাবছি, আত্মগোপন করেছি উত্তমরূপেই। কিন্তু ইতিমধ্যে সীজন যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। আর বেশী দেরি হলে তো বরফ পড়তে আরম্ভ করবে।

'শেষটায় এক বড়কর্তার কাছে ডাক পড়ল। তাঁর প্রাসাদে উঠে দেখি, ইয়া আল্লা। তার সেই উঁচু টিলার স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া জোরদার টেলিস্কোপ। আমরা যখন অস্ট্রিচ পাখীর মত বালুতে মাথা গুঁজে আত্মগোপনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি, ইনি তখন প্রতিদিন নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের প্রতিটি পাহাড় ওঠা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কৌতূহলী হয়ে আমাদের সম্বন্ধে সর্বসংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বেশ রসিয়ে রসিয়ে আদ্যোপান্ত বললেন। আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল—ইস্তেক যে-জাপানী বদন অনুভূতি প্রকাশে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক সেটিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হল।

'কিন্তু বৃথাই আতঙ্ক; আমরা খামোখাই ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছিলুম। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বড়কর্তা সর্বসংবাদ শুনে আমাদের অভিযানাকাঙ্ক্ষা প্রসন্নতর দৃষ্টিতে আশীর্বাদ করেছেন। কারণ, আমরা ধর্ম বা অর্থ কোনোটাই সঞ্চয় করতে যাচ্ছি না—আমরা আসলে তীর্থযাত্রী নই, আর ব্যবসায়ী তো নই-ই। তবে তখনো জানতুম না, আরেকটু হলেই অনিচ্ছায়, অন্তত আমার, মোক্ষলাভটা হয়ে যেত।'

আমি বললুম, 'ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ তিনটের তো জমা-খরচ হল, আর কাম?'

মসোজী বললেন, 'রাম, রাম।' ওর মত প্যুরিটান আমি কোনো মঠ, কোনো মনাস্টেরিতে দেখি নি।

তারপর বিনায়ক রাও আমার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। কত না বনস্পতি, অজানা-অচেনা বিহঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, আন্দোলিত উপত্যকার উপর ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী দোদুল্যমান ফুলের বন্যা, পার্বত্য-নদী, জলপ্রপাত, অভ্রংলেহী পর্বত, পাতালস্পর্শী অন্ধকূপ, সংকটময় গিরি-সংকট, পান্থশালা, চট্টি, পার্বত্য শ্রমণদের জিহ্বানিষ্ক্রমণপূর্বক তৎসঙ্গে ঘন ঘন

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আন্দোলন দ্বারা অভিবাদন, দুর্গন্ধময় স্নেহজাতীয় পদার্থসহ চা-পানের নিমন্ত্রণসহ অতিথি সৎকার। আরো এত সব বিজাতীয় বস্তু ও কল্পনাতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট মাত্র দিতে হলে প্রচুর অবকাশ ও প্রচুরতর পরিশ্রমের প্রয়োজন। য়েতি বা এবমিনেবল স্নোম্যান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বর্ণন করেছিলেন শুধু সেগুলো শিকের হাঁড়িতে সযত্নে তুলে রেখেছি: অস্মদ্দেশীয় সম্পাদক ও প্রকাশকদের শেষশয্যায় সেগুলো তাঁদের রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের শেষ যাত্রাটি বিভীষিকাময় করে দেবার জন্যে!

বিনায়ক রাও বললেন, 'ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করলুম, পাহাড় থেকে নেমে আসছে সবাই, উপরের দিকে যাচ্ছে না কেউই। চট্টির পর চট্টি দেখি হয় জনমানবহীন—দরজা-খা-খা করছে কিংবা তালাবন্ধ—সমস্ত শীতকালভর এখানে তো আর কেউ আসবে না।

'আমরা চড়াইয়ের দিকে শেষ কাফেলাও মিস্ করেছি।

'কিন্তু হাসেগাওয়ার ঐ একটি মহৎ সদ্‌গুণ যে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন না হওয়ার পূর্বে তিনি ঐ নিয়ে মাথা ঘামান না।

'আমরা যতই উপরের দিকে উঠছি, ততই রাস্তা এবং চট্টি জনবিরল হতে লাগলো। শেষটায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পরও কাউকে নেমে আসতে দেখি না—ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তখন দেখি এক পরিত্যক্ত চট্টির সামনে একজন সাধু বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। মোক্ষম শীত পড়েছে কিন্তু সাধুজী কৌপিনসার। সর্বাঙ্গে ভস্মও মাখেন নি কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থারও প্রয়োজন-বোধ করেন নি। অথচ দেহটির দিকে তাকালে মনে হয়, এইমাত্র প্রচুর তেল ডলাইমলাই করে স্নান সেরে উঠেছেন—গা বেয়ে যেন তখনো তেল ঝরছে। আমাদের সঙ্গে চাপাতি ও শুকনো তরকারি ছিল। সাধুজীকে তার থেকে হিস্যে দিলুম। তিনি কোনো প্রকারের বাক্যালাপ না করে খেলেন। আমরাও কোনো প্রশ্ন শুধালুম না। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, তিনি তখনো সেখানে ঠায় বসে। আমরা তাঁকে প্রণাম করে রাস্তায় নামবার সময় মনে হল এই যেন সর্বপ্রথম তাঁর চোখে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল—সে পরিবর্তনে যেন আমাদের প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে। রাস্তায় নামার পর হাসেগাওয়া বললো, 'আমার দুশ্চিন্তা গেছে। আমাদের যখন উনি চড়াইয়ের পথে যেতে বারণ করলেন না, তখন মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রা সফল হবে।

'হিমালয়ের অন্যতম এই রহস্যের সমাধান এখনো হয় নি। এইসব একাধিক

সন্ন্যাসী সমস্ত শীতকালটা এসব জায়গায় কাটান কি করে? পাঁচ-সাত হাত বরফ এখানে তো জমেই—সেখানে না আগুন, না কোনো প্রকারের খাদ্য। এক চট্টিওলা আমাকে পরে বলেছিল, বরফের তলায় নাকি একরকমের লতা গজায়। তারই রস নাকি এদের খাদ্য, বস্ত্র, আগুন—সব।

'আর হাসেগাওয়া তুলে যাচ্ছে, একটার পর একটা ছবি। এই গিরি অভিযানে বেরুবার তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—যত পারে, যত রকমের হয়, ফোটোগ্রাফ তোলা। দাঁড়ান, আপনাকে বইখানা দেখাই।'

বিনায়ক রাও নিয়ে এলেন ঢাউস এক ফোটোগ্রাফের বই। মলাটের উপরকার ছবি দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই বই জাপানী। জার্মানরাও বোধহয় এরকম প্রিণ্ট করতে পারে না। কে বলবে এগুলো ব্লক থেকে তৈরি! মনে হয় কণ্টাক্ট প্রিণ্ট!

বিনায়ক রাও বললেন, 'জাপানে ফিরে গিয়ে হাসেগাওয়া তাঁর তোলা ছবির একটি প্রদর্শনী দেখান। সে-দেশের রসিক-বেরসিক সর্বসম্মতিক্রমে এই সঞ্চয়ন ফোটোগ্রাফির প্রথম বিশেষ পুরস্কার পায়।'

ছবি বোঝাবার জন্য এ-বইয়ে টেক্সট অত্যল্প। আমার বড় বাসনা ছিল বইখানা যেন ভারতের বাজারেও জাপানীরা ছাড়ে। কিন্তু ঠিক তখনই মার্কিন হিরোশিমার উপর এটম বোমা ফেলছে। পরবর্তীকালে আমি আবার কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গেলুম।

এ-বইখানা আনাতে কিন্তু আমার অসুবিধা সৃষ্ট হল। বিনায়ক রাও বই আনার পর আর বর্ণনা দেন না। শুধু বলেন, 'এর পর আমরা এখানে এলুম' বলে দেখান একটা ফোটো, ফের দেখান আরেকটা অনবদ্য ছবি। কিন্তু এখন আমি সেসব ছবির সাহায্য বিনা তাঁদের যাত্রাপথের গাম্ভীর্য, মাধুর্য, বিস্ময়, সঙ্কট, চিত্র-বর্ণন করি কি প্রকারে! পাঠক, তুমি নিরাশ হলে, আমি নিরুপায়।

বিনায়ক রাও, হাসেগাওয়া তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, ওঁরা দুজনা পথিমধ্যে একটি কাফেলা পেয়ে গেলেন—এবং অবিশ্বাস্য, সেটা যাচ্ছে উপরের দিকে। এদের ভিতর আছে তীর্থযাত্রী ও অল্পবিত্ত ব্যবসায়ী। এই শেষ কাফেলা। নানা কারণে এদের বড্ড বেশী দেরি হয়ে গিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের মনে শঙ্কা, বরফ-নামার পূর্বে এঁরা পাহাড় থেকে নামতে পারবেন কিনা। তীর্থযাত্রীদের মনে কিন্তু কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা নেই। এ-ধরনের তীর্থদর্শনে যারা বেরয়, তারা ঘরবাড়ির মোহ, প্রাণের মায়া সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েই সম্মুখপানে পা ফেলে। পথিমধ্যে মৃত্যু, মানসে মৃত্যু, গৃহ-প্রত্যাবর্তন না

করা পর্যন্ত যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, তাঁরা আশ্রয় পাবেন ধূর্জটির নিবিড় জটার মাঝখানে—যে-জটা হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে চিরজাজ্বল্যমান।

আর কাফেলার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, কি বিচিত্র দ্বন্দ্বময় পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ এদের জীবনে। যে-প্রাণরক্ষার জন্য এরা দুটি মুঠি অন্ন উপার্জন করতে এসেছে এখানে, সেই প্রাণ তারা রিস্ক করছে প্রতি দিন, প্রতি বৎসর! হুবহু সার্কাসের স্টাণ্ট খেলাড়িদের মত—প্রাণধারণের জন্য যারা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে প্রতি সন্ধ্যায়!

তা সে যাক্। এ-লেখাটি এখন সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, হিমালয়ের বর্ণনাই যখন দিতে পারছি নে, তখন হিমালয় নিয়ে কাহিনী বলা শিবহীন দক্ষযজ্ঞ এবং যদ্যপি হিন্দু পুরাণের সঙ্গে পরিচয় আমার ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এটুকু জানি, সে প্রলয়-কাণ্ড ঘটেছিল এই হিমালয়েই—দক্ষালয়ে।

আমি অরসিক। হঠাৎ শুধালুম, 'বিনায়ক রাও! তোমরা খেতে কি?'

'শেষের দিকে পথে যেতে যেতে—'পথ' বললুম বটে কিন্তু আমি আপনারা পথ বলতে যেটা বোঝেন, সেটাকে অপমান করতে চাই নে—আমার শ্যেনদৃষ্টি থাকতো কিসের উপর জানেন? শকুনি, শকুনি—আমি তখন সাক্ষাৎ শকুনি। শকুনি যেমন নির্মল নীলাকাশে ওড়ার সময়ও তাকিয়ে থাকে নিচে ভাগাড়ের দিকে, আমিও তাকিয়ে থাকতুম নিচের দিকে। কোথাও যদি ভারবাহী য়াক্ পশুর এক চাবড়া গোবর পেয়ে যাই। সে-ঘুঁটেতে আগুন ধরিয়ে ধুঁয়োর ভিতর নাড়াচাড়া করি, চেপে ধরি, দু হাত দিয়ে চড়চাপড় মেরে তৈরি করা এবড়ো-থেবড়ো রুটি—গুজরাতীতে যাকে বলে রোটলা, কাবুলী নানের চেয়েও তিন ডবল পুরু। কিন্তু সেই ডাঁশা রুটিই মনে হত সাক্ষাৎ অমৃত—ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের বিধিদত্ত মান্না, যার স্বাদ আজো ইহুদিকুল ভুলতে পারে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পঙ্গুও ঈশ্বরপ্রসাদাৎ গিরি লঙ্ঘন করে—এটা মানসে পৌঁছে জন্মের মত উপলব্ধি করলুম। হাসেগাওয়ার দর্শনই ঠিক—পঙ্গু বাধ্য হয়েই এগোয় অতি ধীরে-মন্থরে, তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মানসসরোবরে। পঙ্গুর কাছে যা বিধিদত্ত, সুস্থ মানুষকে সেটা শিখতে হয় পরিশ্রম করে।'[১]

---

১ চেকোশ্লোভাকিয়ার পাহাড়-পর্বত হিমালয়ের তুলনায় নগণ্য। সেখানে পাহাড় চড়তে গিয়ে শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে অভিজ্ঞতা হয় সেটি এস্থলে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

বিনায়ক রাও ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সরোবরে স্নান করেছিলুম। আমার জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ভিতর এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল—না? পুণ্যস্নান তো বটে।'

বিনায়ক রাও শিউরে উঠলেন, 'বাপরে বাপ! জলে দিয়েছি ঝাঁপ আর সঙ্গে সঙ্গে মেরেছি পারের দিকে লাফ। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার। দ্বিপ্রহরের সেই উগ্র রৌদ্রে আমি ঘণ্টাদুয়েক ছুটোছুটি করেছিলুম শরীরটাকে গরম করার জন্যে। ছুটেছি পাগলের মত দু-হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা-দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আছাড় মেরে মেরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থামতে বাধ্য হয়েছি। ফাঁসির লাশের মত জিভ বেরিয়ে গিয়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে। ফের ছুটতে হয়েছে গা গরম করার জন্য। গা আর কিছুতেই গরম হয় না। সে কী যন্ত্রণাভোগ!'

আমি বললুম, 'শুনেছি, গত যুদ্ধে যেসব এ্যার পাইলট শীতকালে ইংলিশ-চ্যানেলের জলে পড়েছে, তাদের কেউই কুড়ি মিনিটের বেশী বাঁচে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'লোকে বলে, অগ্নিপরীক্ষা! আমি বলি শীতের পরীক্ষা।'

'হ্যাঁ, আফ্রিকাবাসীরাও বলে—Heat hurts, cold kills.'

বিনায়ক রাও বললেন, 'হাসেগাওয়া প্রাণভরে ছবি তুললেন। তারপর প্রত্যাবর্তন। অন্য পথ দিয়ে।

মিরেক (একজন পাহাড়-বন-বিভাগের চৌকিদারকে) শুধোলে, 'আচ্ছা, আপনি এত আস্তে চলছেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে চৌকিদার হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর বললেন—'শুনুন। বহু বছর, চল্লিশেরও উপর, বনের পথে, পাহাড়ে রাস্তায় নানান গতিতে হেঁটেছি। কখনও জোরে কখনও ধীরে। আপনাদের মত আগে হাঁটতুম, আরো জোরে হাঁটতুম। লাফিয়ে ঝাঁফিয়ে পাহাড়ে উঠে তার পর হাঁপাতুম। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর শুয়ে জিরিয়ে নিতুম, তারপর আবার চলতুম। কাজের তাগিদে কখনো সারাদিন হাঁটতে হয়েছে, কখনও সারারাত। কিন্তু এই যে এখনকার আমার চলার গতি দেখছেন, এ হচ্ছে বহুদিনের বহু সাধনার পর আবিষ্কৃত। এ গতিতে চললে কখনও ক্লান্তি আসবে না শরীরে। যত দূর-দূরান্তরে বনান্তরে যান না কেন, যাত্রার শুরুতে যেমন শরীর তাজা তমনিই থাকবে। চরণিক, প্রথম (বেঙ্গল) সংস্করণ, পৃ ১১৩।১৪।

'চলেছি তো চলেছি, তারপর এল আমাদের কঠিনতম সংকট। আমাদের একটা গিরিসংকট পেরুতে হবে। এবং এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ গিরি-সংকট। সমুদ্রতট থেকে বারো হাজার ফুট উঁচুতে না বাইশ হাজার আমার মনে নেই। এবং একটুখানি যাওয়ার পরই আরম্ভ হয় চড়াইয়ের পর চড়াই। ক্যারাভানের এক ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিল, যেসব তীর্থযাত্রী মারা যায়, তাদের অধিকাংশই মরে এইখানে।

'ক্রমেই বাতাসের অক্সিজেন কমে আসছিল। অতিকষ্টে আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটা লোক অকাতরে ঘুমুচ্ছে 'পথের' এক-পাশে। কাছে এসে বুঝলুম, মৃতদেহ! এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ। এ-বছরে মরেছে, না গেল বছরে বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমি শুনেছিলুম, উপরে-নিচে বরফ থাকে বলে মড়া পচে না।

'এর পর আরো কয়েকটা। আমি মাত্র একবার একজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম, আহা! সে কী শান্ত, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মুখেও আমি এরকম আনন্দভরা আত্মসমর্পণের ছবি দেখি নি।

'ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি গেল অন্যদিকে। দেখি, আমাদের দলের একজন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। আমি জানতুম, এবং হাসেগাওয়াও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে বলবান যুবা পুত্রও হাত বাড়িয়ে মাতাকে পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে না। কারো শরীরে একবিন্দু উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে, সে সেটা অন্যের উপকারে লাগাবে। সামান্য দুটি কথা বলে যে সাহস দেবে সে শক্তিও তখন মানুষের থাকে না। আমার মনে হল, হালকা একটি পালক দিয়েও যদি কেউ আমাকে ঠোনা দেয় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো।

'আমি খুব ভালো করেই জানতুম, কাফেলা কারো জন্য অপেক্ষা করে না; করলে সমস্ত কাফেলা মরবে। আমাদের যে করেই হোক সন্ধ্যা নাগাদ সামনের আশ্রয়স্থলে পৌঁছুতে হবে।

'এমনিতেই আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল শম্বুকগতি। আমি সেটাও কমিয়ে দিলুম ঐ বৃদ্ধকে সঙ্গ দিতে। হাসেগাওয়া বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে সে তাকাল। আমি ইঙ্গিতে জানালুম, সে যেন তার গতি শ্লথ না করে।'

এস্থলে আমি সামান্য একটি তথ্যের উল্লেখ না করলে কর্তব্যবিচ্যুতি হবে।

বিনায়ক রাওয়ের মত পরদুঃখকাতর মানুষ আমি এ-জীবনে কমই দেখেছি, এবং একেবারেই দেখি নি পরোপকার গোপন রাখতে তাঁর মত কৃতসঙ্কল্প জন। প্রভু যীশুর আদেশ 'তোমার বাঁ হাত যেন না জানতে পারে তোমার ডান হাত কি দান করলো' এরকম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি কোনো খৃষ্টান অখৃষ্টান কাউকে দেখি নি। কাফেলার বৃদ্ধের প্রতি তাঁর দরদ গোপন রাখতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই তাই করতেন—এ সত্য আমি কুরান স্পর্শ করে বলতে রাজী আছি। কিন্তু এটা গোপন রাখলে তাঁর মূল বক্তব্য একেবারেই বিকলাঙ্গ হয়ে যেত বলে তিনি যতটা নিতান্তই না বললে নয়, সেইটুকুই বলেছিলেন।

বিনায়ক রাও সোদনের স্মরণে একটুখানি শ্বাস ফেলে বললেন,—'বৃদ্ধকে আমি বলবো কি—স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন কাফেলা থেকে সে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই যে আমি তার তুলনায় শক্তিশালী, আমারই থেকে থেকে মনে সন্দেহ হচ্ছিল, আমিই কি পৌছতে পারবো গন্তব্যস্থলে? তখন হৃদয়ঙ্গম করলুম, এখানে এ-সঙ্কট থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানসিক বলের। এবং এ বৃদ্ধের সেটা যেন আর নেই। তীর্থদর্শন হয়ে যাওয়ার পর ফেরার মুখে অনেকেই সেটা হারিয়ে ফেলে—কারণ তখন তো সামনের দিকে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর কোনো চরম কাম্য বস্তু নেই। ফিরে তো যেতে হবে আবার সেই সংসারে, তার দিনযাপনের প্রাণ-ধারণের গ্লানির ভিতর।

'আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজে যেন সন্তরণে অক্ষম, আরেক সন্তরণে অক্ষম জনকে সাহায্য করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছি। তবু বললুম, "আরেকটুখানি পরেই উৎরাই। চলুন।" এই সামান্য কটি শব্দ বলতে গিয়েই যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

'বুড়ো আমার দিকে তার ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বললে, "বাবু, তোমার বোতল থেকে একটু শরাব।"

বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি জীবনে কখনো শরাব স্পর্শ করি নি; আমার বুকের পকেটে ছিল চ্যাপ্টা বোতলে জল।

'কোনো গতিকে বললুম, "জল।" বুড়ো বিশ্বাস করে না। কাতর নয়নে তাকায়।

'আস্তে অতি আস্তে বুড়ো এগোচ্ছে ঐ শরাবের আশায়।

'এইভাবে খানিকক্ষণ চললো। হঠাৎ বুঝি বুড়ো লক্ষ্য করেছে কাফেলা একেবারেই অন্তর্ধান করেছে। কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বলল, "জিরোবো।" আমি শুষ্ককণ্ঠে যতখানি পারি চেঁচিয়ে বললুম, "না, না।" আমি জানি, এ জিরোনোর অর্থ কি। এই বসে পড়ার অর্থ, সে আর উঠে দাঁড়াবে না। তার মনে হবে এই তো পরমা শান্তি—আরাম, আরাম। আর শেষ নিদ্রায় ঢলে পড়বে।

'বুড়ো তার শেষ ক'টি কথা বললে যার অর্থ, এক ঢোক শরাব পেলে সে হয়তো সঙ্কট পেরুতে পারবে। আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি আর কী করি? দিলুম বোতল। সে টলতে টলতে বসে পড়ল। এ কী সর্বনাশ! তারপর বোতল মুখে দিয়ে যখন দেখল সত্যি জল, তখন আমার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

'এই শরাবের আশাতেই সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে কোনো গতিকে এসেছে। এবারে শেষ আশা বিলীন হতে সে ঢলে পড়লো।

* * *

'চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ চলার পর উৎরাই আরম্ভ হয়েছিল, কখন যে উপত্যকায় নেমেছি সেগুলো আমার চৈতন্যসত্তা যেন গ্রহণ করে নি।

'সম্বিতে এলুম হঠাৎ বরফপাতের সঙ্গে সঙ্গে। অতি হাল্কা চাদরের মত কি যেন নেমে এল। তবু সম্মুখপানে খানিকটা দেখা যায়। ঈষৎ দ্রুততর গতিতে চলতে আরম্ভ করলুম। কয়েক মিনিট পরেই বরফপাত থেমে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, একটুখানি বেশী আগেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসেছি।

'সামনে উপত্যকা, এবং এইমাত্র যে বরফপাত হয়ে গেল তারই "কল্যাণে" মুছে গেছে কাফেলার পদচিহ্ন। এবং সঙ্কটটাকে যেন তার বীভৎসতম রূপ দেবার জন্য সামনে, ধীরে ধীরে, নেমে আসছে কুয়াশার জাল—দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে।

'তারই ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলুম, আরেকটু সামনে একটা পাথরের টিলা। সেখানে পৌঁছে আমাকে যেতে হবে হয় বাঁয়ে নয় ডাইনে। কিন্তু মনস্থির করি কি প্রকারে? বরফের উপর যে কোনো চিহ্নই নেই। তবু আমার মনে যেটুকু দিক্-বিদিক জ্ঞান ছিল সেটা পরিষ্কার বললে, যেতে হবে বাঁ দিকে।

'এমন সময় হঠাৎ কুয়াশার ভিতর যেন একটু ছিদ্র হল, এবং তার ভিতর দিয়ে এক মুহূর্তের তরে, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, দেখি একটা কুকুরের ইঞ্চি-তিনেক লেজ, বোঁ করে ডান দিকে মোড় নিল, কুকুরটাকে কিন্তু দেখতে

পেলুম না—'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কুকুর! কোথাকার কুকুর? কুকুরের কথা তো এতক্ষণ কিছু বলো নি!'

'ও। সত্যি ভুলে গিয়েছিলুম। ঐ কুকুরটা থাকতো একটা চট্টিতে। আমরা সে চট্টিতে, বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে, দিন তিনেক ছিলুম। ঐ সময় আমি ওটাকে সামান্য এটা সেটা খেতে দিয়েছি। সে-চট্টি ছাড়ার খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি আমার পিছু নিয়েছেন। বিস্তর হাই-হুই করে পাথর ছুঁড়েও তাকে চট্টিতে ফেরত পাঠাতে পারলুম না।'

আমি বললুম, 'এই তো সেই জায়গা যেখানে যুধিষ্ঠিরের সারমেয় তাঁকে ত্যাগ করতে চায় নি।'

মসোজী বললেন, 'এসব কেন, কোনো কুকুরেরই লেজ কাটা উচিত নয়; তবু কে যেন বেচারীর বাচ্চা বয়সে তার লেজ কেটে দিয়েছিল। আমি দেখতে পেলুম সেই টুকরোটুকু, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটা মোড় নিল ডানদিকে।

'আমার অভিজ্ঞতা, আমার পর্যবেক্ষণ, আমার বিচারশক্তি সব—সব—আমাকে চিৎকার করে বলছিল, "বাঁ দিকে বাঁ দিকে মোড় নাও" আর অতি স্পষ্ট যদিও অতিশয় ক্ষণতরে আমি দেখলুম, কুকুরটার লেজ মোড় নিল ডান দিকে।

'আমি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে কুকুরটার লেজকেই বিশ্বাস করলুম বেশী।

'কুকুরটাকে কিন্তু তখনকার মত আর দেখতে পেলুম না।

'ঘণ্টাটাক পরে চট্টিতে পৌঁছলুম। হাসেগাওয়া বললেন, আমি বুড়োর জন্য অপেক্ষা করার পর থেকেই কুকুরটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল। শেষটায় সে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'আর বাঁ দিকে মোড় নিলে কি হত?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই বুঝলুম আমি একটা ইডিয়ট্।

বিনায়ক হেসে বললেন, 'তাহলে আপনি আপনার বন্ধু বিনায়ককে আর—'

আমি বললুম, 'ষাট ষাট'।[২]

---

২ বিনায়ক রাও আমাকে তাঁর মানস-গমন কাহিনী বহু বৎসর পূর্বে বলেছিলেন। এখন কেতাবপত্র ঘেঁটে লুপহোল্‌গুলো যে পূর্ণ করা যেত না তা নয়, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল এই খাপছাড়া খাপছাড়া অসম্পূর্ণ পাঠটাই সত্যের নিকটতর থাকবে।

নটরাজনের একলব্যত্ব

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার উপর দিয়ে পূবৈয়া বায়ু বইতে আরম্ভ করে না। সে হাওয়া আসে তার দিন আষ্টেক পরে। কিন্তু তখনই সাড়া পড়ে যায় বন্দরে বন্দরে মাঝি-মহল্লায়। হালের বলদ পালের গরু বিক্রি করে তারা তখন কেনে নৌকোর পাল। পুরনো পালে জোড়াতালি দিয়ে যেখানে চলে যাওয়ার আশা, সেখানে চলে কাঁথার ছুঁচ আর মোটা সুতো। তার পর আসবে ঝোড়ো বেগে পূব হাওয়া। দেখ্ তো না দেখ্, নারায়ণগঞ্জী নৌকো পৌঁছে যায় রাজশাহী। বিশ্বাস করবেন না, স্রোতের উজানে, তর তর করে।

আমিও বসে আছি হাল ধরে, পাল তুলে—হাওয়া এই এল বলে। নোঙর নিই নি। এই শেষ যাত্রায় যেতে হয় এক ঝটকায়। কোথাও থামবার হুকুম নেই।

নাতি ডাবাটি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাদু, তামুক খাও।'

হাওয়ার আশায় বসে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ-আবেশে ভরে যায়।

নাতি বললে, 'দাদু, সারাজীবন ধরে পদ্মার উজান-ভাটা করলে। কত লোকের সঙ্গেই না তোমার দোস্তী হল। বাড়িতে থেকে খেত-খামার করে দোকানপাট চালালে তো অতশত লোকের সঙ্গে তোমার ভাবসাব হত না—আর বিদেশীই বা কিছু কম। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকের রং-বেরংয়ের চিড়িয়া। আমারে কও, তাদের কথা।'

শ্রীযুত গাঙ্গুলীর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটু আগেই ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। মোরাভিয়ার পাহাড় তেমন কিছু উঁচু নয়, কিন্তু বরফের ঝড়ে কিংবা নিছক ক্লান্তিবশতঃ পর্যটকের মরণবরণ একই পদ্ধতিতে হয়। গাঙ্গুলিমশাই লিখছেন :

'সেবারে দুটি স্লোভাক ছেলে প্রাড্‌য়েটের চুড়োয় এসে হাজির হল। তখন খুব বরফ পড়ছে। (সেখানকার) কাফিখানায় এক চুল জায়গা নেই—যত রাজ্যের শী-চালক সেখানে এসে জমেছে। এই দুই স্লোভাক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করায় তারা জবাব দিলে—চের্তেনে সেডলো।

বরফ পড়লেও দিনটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ছেলে দুটি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই হঠাৎ কুয়াসা এসে চারিদিক ছেয়ে ফেললো। তারপর এই কুয়াসা কাটল না, ছেলে দুটিও ফিরে এল না। এদিকে অন্ধকার নেমে এল

আমি পদ্মা নদীর মাঝি নই। কিন্তু আমার জীবনধারা বয়ে গেছে পদ্মার চেয়েও দেশদেশান্তরে। কত না অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি, কত না বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এখন পাল তুলে ওপারে যাবার মুখে ভাবছি, এঁদের কারো কারো সঙ্গে আপনাদেরও পরিচয় করিয়ে দি। কারণ এঁদের সম্বন্ধে অন্য কেউ যে মাথা ঘামাবে সে আশা আমার কম—প্রচলিতার্থে এঁরা দেশের

আর তারই সঙ্গে ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

কাফিখানার মালিক উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী ছেলে দুটিকে খোঁজবার জন্যে কয়েক-জনকে পাঠালেন। তারা শী নিয়ে কোমরে টর্চ বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে ঐ ঘন তুষারপাতের মধ্যে যাবে কোথায়? যাবেই বা কি করে? বিশেষ কিছু লাভ হল না। তারা ফিরে এল। কিন্তু ছেলে দুটি আর ফিরল না।

পরদিন সকালবেলা বরফের উপর রোদ পড়ে যখন চারিদিক ঝলমল করে উঠল, তখন দেখা গেল রাত ভোর এত বরফ পড়েছে যে ছেলে দুটি যদি কোথাও মরেও পড়ে গিয়ে থাকে তাদের দেহ খুঁজে বার করবার কোনো উপায় নেই। আশপাশের যত কুটির যত গ্রাম আছে সব জায়গা থেকে যখন খবর এল যে ছেলে দুটি কোথাও পৌঁছয় নি তখন বোঝা গেল এই অঞ্চলের বরফের মধ্যে তাদের সমাধি হয়েছে।

সারা শীতকাল ছেলে দুটি তাদের অজানা সমাধির মধ্যে রইল শুয়ে। তারপর যখন প্রথম বসন্তের হাওয়ায় বরফ গলতে আরম্ভ করল তখন তাদের অবিকৃত দেহ আবিষ্কার হয় এই জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলো আধপোড়া দেশলাই-এর কাঠি ছড়ানো।

বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়ার এই হচ্ছে বিপদ। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মত হলে যে ক্লান্তি আসে সে বড় ভয়ানক ক্লান্তি। দু-চারটে দেশলাই জ্বেলে কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? দেহ মন চোখ সমস্ত ঘুমে জড়িয়ে আসে। হঠাৎ শীতের অনুভূতি আর থাকে না। মনে হয় বরফেরই কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। তখন মনে হয় জেগে থাকার চেষ্টা করার মধ্যেই যত অস্বস্তি যত কষ্ট! ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আরাম! তারপর একবার সেই ঘুমের কোলে কেউ ঢলে পড়লে, সে ঘুম আর ভাঙ্গে না। বরফের মধ্যে মৃত্যুকে ঠিক জীবনের অবসান বলা যায় না—এ যেন এক গভীর সুষুপ্তি।'

কুতুবমিনার নন। অথচ আমার বিশ্বাস এঁরা যদি সত্যই এম্‌বিশাস্‌ হতেন তবে আজ আমার মত অখ্যাত জনের কাঁধে এঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়তো না, আর পড়লেও সেটা আমি গ্রহণ করতুম না। কারণ এঁদের আমি ভালোবেসেছিলুম এঁরা লাওৎসের চেলা বলে। তাঁরই উপদেশ মত এঁরা জীবনের মধ্য-পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, আপন প্রতিভা যতদূর সম্ভব চাপা রেখে গোপনে গোপনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাধা পড়লে লড়াই দিতেন মোক্ষম, কিন্তু সর্বক্ষণ এঁদের চরিত্রে একটা বৈরাগ্য ভাব থাকতো বলে মনে মনে বলতেন, 'হলে হল, না হলে নেই।'

কিন্তু আমাকে একটু সাবধানে, নাম পরিচয় ঢেকে চেপে লিখতে হবে। পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি এঁরা জীবন-সভাস্থলে প্রধান অতিথির আসনে বসে ফুলের মালা পরতে চান নি, তাই পাঠক সহজেই বুঝে যাবেন, কারো লেখাতেও তাঁরা হ্যামলেট, রঘুপতি হতে চান না—আমার নাতিপরিচিত লেখাতেও না।

মনে করুন তার নাম নটরাজন। তার পিতা ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, আশা করেছিলেন ছেলেও তাঁর মত চারটে পাস দিয়ে একদিন তাঁরই মত বড় চাকরি করবে। অন্যায্য আশা করেন নি, কারণ নটরাজন ক্লাসের পয়লা নম্বরী না হলেও প্রোমোশন পেত অক্লেশে, আর একটা বিষয়ে ইস্কুলের ভিতরে বাইরে সবাইকে ছাড়িয়ে যেত অবহেলে। ছবি আঁকাতে। তার অঞ্চলে এখনও দেওয়ালে রঙিন ছবি আঁকার (ম্যুরাল) রেওয়াজ আছে। তারই ওস্তাদ পটুয়ারা স্বীকার করতেন, নটরাজনের চতুর্দশ পুরুষে যদিও কেউ কখনো ছবি আঁকেন নি—তাঁরা খানদানী, পটুয়া হতে যাবেন কোন্‌ দুঃখে—এ ছেলে যেন জন্মেছে তুলি হাতে নিয়ে। শুধু তাই না—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এদেশে যখন হরেক রকম রঙের অভাব চরমে পৌঁচেছে তখন নটরাজন দেশের কাদামাটি কাঁকর পাথর ফুলপাতা থেকে বানাতে আরম্ভ করলো নানা রকমের রঙ। এটা ঠিক আর্টিস্টের কাজ নয়—এর খানিকটে কেমিস্ট্রি বাকিটা ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান্‌শিপ। পটুয়ারা নটরাজনকে প্রায় কোলে তুলে নিলেন। তখন তার বয়েস বারো-তেরো।

রবিবর্মা তার অঞ্চলেরই লোক। ওঁর ছবি কিন্তু নটরাজনকে বিশেষ বিচলিত করে নি। হঠাৎ একদিন সে দেখতে পেল নন্দলালের একখানা ছবি। জঘন্য রিপ্রডাক্‌শন্‌—রেজিস্ট্রেশন এতই টালমাটাল যে মনে হয় প্রিণ্টার তিনটি বোতল

টেনে তিনটে রঙ নিয়ে নেচেছে।

নটরাজন কিন্তু প্রথম ধাক্কায় স্তম্ভিত। দ্বিতীয় দর্শনে রোমাঞ্চিত। মধ্য রজনী অবধি সে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নটরাজন ছিল অসাধারণ পিতৃভক্ত। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা কি আশা পোষণ করেন সে তা জানতো। কি করে তাঁকে বলে যে সে তার গুরুর সন্ধান পেয়ে গিয়েছে; সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর পদপ্রান্তে তাকে যেতেই হবে। তদুপরি কোথায় মালাবার আর কোথায় শান্তিনিকেতন!

পিতাই লক্ষ্য করলেন তার বিষণ্ণ ভাব। পিতাপুত্রে সখ্য ছিল—দূরত্ব নয়। সব শুনে বললেন, 'বাঁধা পথে যে চলে না তার কপালে দুঃখ অনেক। কিন্তু আপন পথ খুঁজে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ আরো বেশী। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগ। যারা 'গোলামী-তালিম' চায় না, তারা যাবে কোথায়? বিশ্বকবি কবিগুরু যেন বিধির আদেশে ঠিক ঐ শুভলগ্নেই শান্তিনিকেতনে তাদের জন্য নীড় নির্মাণ করেছিলেন—যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্। দূর সিন্ধু, মালাবার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, আসাম থেকে ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো—দলে দলে নয়, একটি দুটি করে।

যারা এল তাদের মধ্যে দু-চারটি ছিল লেখাপড়ায় বিদ্যেসাগর, বাপ-মা-খ্যাদানো বিশ্ববকাটে। বিশ্বভারতীই তো বিশ্ববকাটেদের উপযুক্ত স্থান, ঐ ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস! আসলে এরা ছিল কোনো কৌশলে ইস্কুল থেকে নাম কাটাবার তালে। অসহযোগের সহযোগিতায় তারা সে কর্মটি করলো নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে।

বলা বাহুল্য আমি ছিলুম এই দলের।

হিন্দী-উর্দুতে বলে 'পাঁচো উঙলিয়া ঘীমেঁ আর গর্দন ডেগমে'—অর্থাৎ 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে আর গর্দানটাও হাঁড়ায় ঢুকিয়ে ভোজন।' আমরা যে ভূমানন্দ—ভূমা, বিশ্বপ্রেম, অমৃতের পুত্র এসব কথা তখন ছিল আমাদের ডালভাত—আমাদের মধুরতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি, এখানে এসে দেখি সে-অমৃত উপচে পড়ছে। সে যুগে বিশ্বভারতীর প্রথম নীতি ছিল, আমি অক্ষরে অক্ষরে তুলে দিচ্ছি: 'The system of examination will have no place in Visvabharati, nor will there be any conferring of degrees.'!!

বঙ্কিম চাটুয্যের কল্পনাশক্তি বড়ই দুর্বল। তিনি রচেছিলেন,

'ছাত্রজীবন ছিল সুখের জীবন
যদি না থাকিত এগজামিনেশন।'

বিশ্বভারতী বঙ্কিমের সে স্বপ্ন মূর্তমান করেছিল।

এবং ধর্মতঃ ন্যায্যতঃ প্রাগুক্তনীতির পিঠ পিঠ আসে: যেখানে পরীক্ষা নেই সেখানে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া না-হওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। অতএব রেজিস্ট্রি নেই, রোল্-কল্ নেই!

আমাদের অভাব ছিল মাত্র একটি—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যা-ই হোক—চায়ের দোকান। তাই ছিল ঘরে ঘরে স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।

সত্যকুটিরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে শুনছি ভিতরে স্টোভের শব্দ। কেষ্‌নগরের মণি গাঙ্গুলী চা বানাচ্ছে। সামনে, গৌরপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে, লাইব্রেরির বারান্দায় ঈষৎ প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। বৈতালিকের মূলগায়েন শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার (পরবর্তী যুগে খ্যাতিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ) ও দোহারদের ফুলু রায় গান বাছাই করছেন। পূজনীয় বিধু-ক্ষিতি-হরি একটু পরেই আসবেন।

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম আশ্রমে এসেছে তারা ভোরের বৈতালিকে উপস্থিত হত। আমাদের দলটা 'গুডি গুডি'দের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘু। অবশ্য আমরা দম্ভভরে গুরুদেবকেই উদ্ধৃত করে বলতুম, The rose which is single need not envy the thorns which are many. কিন্তু তক্কে তক্কে থাকতুম, দল বাড়াবার জন্য।

হঠাৎ চোখ পড়লো নয়া মালের দিকে। দূর থেকে মনে হল চেহারাটা ভালোই—ভালোমানুষ। জানলা দিয়ে ভিতরের গাঙ্গুলীকে বললুম, 'এসেছে রে'। গাঙ্গুলী এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে গান ধরলে,

'শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে বনের প্রাণী—'

অর্থাৎ বিশ্বভারতীর ডাক শুনে বনের প্রাণীরা এসে জুটেছে!

ইনিই হলেন আমাদের নটরাজন।

দুপুরবেলা খাওয়ার পর তাকে গিয়ে শুধালুম, 'টেনিস খেলতে জানো?' বড়ই গাঁইয়া—মাস ছয় পূর্বে আমো ছিলুম, এবং বললে পেত্যয় যাবেন না, এখনো আছি—হকচকিয়ে 'ইয়েস ইয়েস, নো নো, ইয়েস ইয়েস' বললে। 'র‍্যাকেট নেই? কুছ পরোয়া ভী নেই, আমারটা দোব'খন।' এরপর ভাব হবে

না কেন ?

তবে লাভ হল না। কলাভবনের ছাত্র। আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম। তবে দেখলুম, বাউণ্ডুলে স্বভাব ধরে। তখন তখন স্কেচ বই নিয়ে খোঁয়াইডাঙার ভিতর ডুব মারে। সাঁওতাল গ্রাম থেকে ডিম কিনে এনে গোপনে যে সেদ্ধ করে খাওয়া যায়—আশ্রম তখনো নিরামিষাশী—সেটা ওকে শিখিয়ে দিলুম। সে তো নিত্যি নিত্যি খোঁয়াই পেরিয়ে সাঁওতাল গাঁয়ে যায়—তার পক্ষে ডিম যোগাড় করা সহজ।

কিন্তু ঐ গোবেচারাপারা ছোঁড়াটা পেটে যে কত এলেম ধরে সেটা অন্তত আমার কাছে ধরা পড়লো অল্পদিনের ভিতর। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অনেকক্ষণ অবধি এদিক থেকে, ওদিক থেকে, এগিয়ে পিছিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তুললো দুটি ফোটো। পরে প্রিণ্ট দেখে আমার চক্ষুস্থির। এ যে, বাবা, প্রফেশনালেরও বাড়া! এবং আজ আমি হুহুরের দেবতা বিশ্বকর্মাকে সাক্ষী মেনে বলছি, পরবর্তী যুগে কি বার্লিন কি লণ্ডন কেউই টেকনিকালি আমার এমন পারফেক্ট ছবি তুলতে পারে নি—এবং স্মরণ রাখবেন, নটরাজনের না ছিল কৃত্রিম আলো বা স্টুডিয়ো।

এরপর যা দেখলুম সে আরো অবিশ্বাস্য। নটরাজনের অন্যতম গুরুর প্রথম মেয়ের বিয়ে। কোথায় গয়না গড়ানো যাবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। স্বল্পভাষী নটরাজন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ শোনার পর বললে, 'আমাকে মাল-মশলা দিন। আমি করে দিচ্ছি।' সবাই অবাক ; 'তুমি শিখলে কোথায় ?' বললে 'শিখি নি, দেখেছি কি করে বানাতে হয়।' নন্দলাল চিরকালই এ্যাড-ভেঞ্চার-একস্‌পেরিমেণ্টের কলম্বাস। দিলেন হুকুম, 'ঝুলে পড়।'

বিশ্বকর্মাই জানেন স্যাকরার যন্ত্রপাতি কোত্থেকে সে যোগাড় করলো, কি কৌশলে কাজ সমাধা করলো। গয়না দেখে কে কি বলেছিলেন সেটা না বলে শুধু সবিনয় নিবেদন করি, হিন্দু বিয়েতে বরপক্ষ আকছারই সহিষ্ণুতায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসেন না—তাঁরা পর্যন্ত পঞ্চমুখে গয়নার প্রশংসা করেছিলেন।

নটরাজনের অন্যান্য গুণ উপস্থিত আর উল্লেখ করছি না। তার পরবর্তী ঘটনা বোঝার জন্য একটি গুণকীর্তন করি। এস্তেক বর্ণপরিচয় স্পর্শ না করে শুধু কান দিয়ে সে শিখেছিল অদ্ভুত সড়গড় চলতি বাঙলা। আমাকে শুধু গোড়ার দিকে একদিন শুধিয়েছিল, 'বাঙলার কি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ নেই ? উচ্চারণে উচ্চারণে যে আসমান জমীন ফারাক ? কোন্‌টা শিখি ?'

শান্তিনিকেতনে তখন ছিল নিরঙ্কুশ 'বাঙাল' রাজত্ব। 'পাঁচটা বাঁদরের'

বদলে 'পাস্টা বাদর' হামেশাই ঝোপঝাড় থেকে 'বেরিয়ে পড়ার' বদলে 'বেড়িয়ে পরতো', অবিড়াম ঝড় ঝড় বাড়ি-ধাড়ার মাঝখানে। আমি নটরাজনকে বললুম, 'আর যা কর্ কর্, দোহাই আল্লার, আমার উচ্চারণ নকল করিস্ নি। আমি বাঙালস্য বাঙাল—খাজা বাঙাল। আর করিস নি গুরুদেবের। তাঁর ভাষা, তাঁর উচ্চারণ তাঁর মুখেই শোভা পায়। করবি তো কর্ তোর গুরু নন্দলালের উচ্চারণ। বাঙলায় এম. এ. পাশ ধুরন্ধররাও ওরকম সরল চলতি বাঙলা বলতে পারে না।'

তার পর ঝাড়া বিশটি বছর আমাদের দুজনাতে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, চিঠি-পত্রও না। এই বিশ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে থাকলে পৌষ মেলায় কখনো-সখনো শান্তিনিকেতন গিয়েছি। ওর সাক্ষাৎ পাই নি। সত্যি বলতে কি, ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু কেউ কখনো অচলিত গান

জগপতি হে
সংশয় তিমির মাঝে
না হেরি গতি হে—

গাইলে মনে পড়তো নটরাজন ওর সুরটা বড় দরদভরা করুণ সুরে বাঁশীতে বাজাতো।

১৯৪৭ সাল। স্বরাজ যখন পাকা ফলটির মত পড়ি পড়ি করছে ঐ সময়ে আমি একদিন বাঙ্গালোরের এক রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি। দেখি, তিনটি প্রাণী ঢুকে এককোণে আসন নিল। একজন চীনা কিংবা জাপানী ছোট্টখাট্টো এক মুঠো মেয়ে, দ্বিতীয়া সুডৌলা তরুণী—খুব সম্ভবত তামিল—এবং সঙ্গে এ কে? নটরাজন! চেহারা রত্তিভর বদলায় নি। শুধু কপালটি আরো চওড়া হয়েছে, চুলে বোধ হয় অতি সামান্য একটু পাক ধরেছে। আমার চেহারা বদলে গেছে আগা-পাশ-তলা কিন্তু আর্টিস্ট নটরাজনকে ফাঁকি দিতে হলে প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়, এবং চোখ দুটো 'আই-ব্যাঙ্কে' জমা দিতে হয়। নটরাজন আমাকে দেখা মাত্র উঠে এসে আমাকে তার টেবিলে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তামিলটি লেডি ডাক্তার, বিধবা, প্র্যাকটিস করেন, এবং জাপানীটি তাঁর স্ত্রী। শুধালাম, 'তুমি আবার জাপান গিয়েছিলে না কি?' সেই মুখচোরা নটরাজন মুখ-চোরাই রয়ে গেছে। বললে 'অনেক বছর কাটিয়েছি।'

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। শুধু বললে, শহরের তিন মাইল দূরে

ফাঁকা জায়গায় সেরামিকের ছোটখাটো কারখানা করেছে, বাড়িও। আমাকে শনিবার দিন উইক-এণ্ড করতে সেখানে নিয়ে যাবে। আমার ঠিকানাটা টুকে নিল।

এস্থলে বলে রাখা কর্তব্য বিবেচনা করি, আমি কুমোরের হাঁড়িকুড়ি থেকে আরম্ভ করে সেরামিক, পর্সেলিন, গ্লেজড্ পটারি, ফাইয়াঁস এসবের কিছুই জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে স্টোনওয়েয়ার পাথরের জিনিস নয়—সেটা আমরা যাকে তামচিনি বলি, মেয়েরা যে সব বোয়ামে আচার-টাচার রাখেন। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন হল এই কারণে যে সেই সন্ধ্যায় এক বন্ধুকে নটরাজনের কথা তুলতে তিনি বললেন, 'সেরামিক বাবদে ও যা জানে না, সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগেস্ট একস্পার্ট ইন দি ঈস্ট। এখানকার সরকারী সেরামিক ফ্যাক্টরির বড় কর্তা।'

শনির সন্ধ্যায় নটরাজন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বউ একটি-মাত্র কথা না বলে যা যত্ন-আত্তি করলে সেটা দেখে বুঝলুম কেন চীন-জাপানে প্রবাদ প্রচলিত আছে 'চীনা খাদ্য আর জাপানী স্ত্রী—স্বর্গ-সুখ : চীনা স্ত্রী আর জাপানী খাদ্য—নরক ভোগ।' জাপানী স্ত্রীজাতির মত কর্মঠ, শান্ত, সেবাপরায়ণ রমণী নাকি ইহসংসারে নেই।

আহারাদির পর নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বলুন।'

নানা কথা হওয়ার পর আমি বললুম, 'জাপানের কথা কও।'

নটরাজন সে রাত্রে কিছুটা বলেছিল, পরে আরো সবিস্তার।

বললে, 'শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আমার ধারণা হল যে আর্টসের চেয়ে ক্রাফ্‌টসেই আমার হাত খোলে বেশী।'

আমি বললুম, 'সে আর বলতে! সেই যে, গয়না বানিয়েছিলে!'

বললে, 'সে কথা আর তুলো না। হাত ছিল তখন বড্ড কাঁচা। তা সে যাক্। নানা ক্রাফ্‌টস্ শিখলুম অনেক জায়গায়। শেষটায় চোখ পড়লো পর্সেলিনের দিকে। সামান্য কিছুটা শেখার পরই বুঝলুম, এ একটা মারাত্মক ব্যাপার, একটা নূতন জগৎ, এর সাধনায় আস্ত একটা জীবন কেটে যায়। মেলা কেতাবপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করলুম যে, যদিও চীন এই কর্মে একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, ড্রেস্‌ডেন্‌ও একদা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু জাপান এর রাজা।

ঘটি-বাটি বিক্রি করে চলে গেলুম জাপান।

টোকিয়ো পৌঁছনোর কয়েকদিন পরেই দেখি আমার ল্যাণ্ডলেডি চীনামাটি

নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার কাছ থেকে খবর পেলুম, পর্সেলিন অর্থাৎ চীনা-মাটির বাসনকোসন, কাপ-সসার বানানো এদেশে কুটিরশিল্পও বটে। সে কি করে হয়! যে মাটি দিয়ে পর্সেলিন তৈরী হয় তার থেকে বালু আর অন্যান্য খাদ সরাবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয় অনেকখানি জায়গা নিয়ে—আমি এখানে, বাঙালোরে এসে করেছি, কিন্তু ঠিক ওৎরাচ্ছে না, এখানকার মাটি ভালো নয়—খরচাও বিস্তর। ল্যাণ্ডলেডি বললে, বাজারে রেডিমেড কাদা বিক্রি হয়। আমি ল্যাণ্ডলেডিকে বললুম, সে না হয় হল, কিন্তু পোড়াবে (fire করবে) যে, তার জন্যে কিল্‌ন্ ফারনেস্ (পাঁজা) পাবে কোথায়?'

আমি বাধা দিয়ে নটরাজনকে বললুম, 'আমাদের কুমোররা—'

বললে, 'হায়, হায়! ঐ টেম্পারেচারে মাটির হাঁড়িকুড়ি হয়। গ্লেজড্ পটারির—এ দেশের সব বস্তুই তাই—জন্য আরো টেম্পারেচার তুলতে হয়, আর কমসে কম দু হাজার ফারেনহাইট না হলে—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্। ওসব আমি বুঝবো না।'

বললে, 'হ্যাঁ সেই ভালো। তার পর খবর নিয়ে ন্যাজেমুড়ো অবধি ওকিবহাল হয়ে গেলুম। নিজের চাই শুধু একটা পটারস হুইল—কুমোরের চাক। বাজার থেকে রেডি-মেড কাদা এনে তাতে চড়িয়ে বানাবে যা খুশী। সেগুলো ভেজা থাকতে থাকতেই তার উপর আঁকবে ছবি—নিজস্ব আপন অনুপ্রেরণায়, এবং একই ছবি দুসরা সেটে আবার নকল করবে না, যে রকম খাস পেণ্টাররা একই ছবি দু'দুবার আঁকেন না। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো ঠেলায় করে নিয়ে যাবে কিল্‌ন্‌ওলার কাছে। বহু লোকের কাছ থেকে এক রাশ জমা হলে তবে সে ফায়ার করবে, নইলে খর্চায় পোষায় না। তবে মোটামুটি বলে দেয় কবে এলে তোমার মাল তৈরী পাবে। মাল খালাসীর সময় দেবে তার মজুরী। তার পর তুমি তোমার মাল পর্সেলিনের দোকানে দিয়ে আসতে পারো—তারা বিক্রি করে তাদের কমিশন নেবে—কিংবা তুমি ঠেলা ভাড়া করে তার উপর মাল সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াতে পারো।'

আমি বললুম, 'ব্যবস্থাটা উত্তম বলতে হবে। তার পর?'

'জিনিসটা যে এত সরল সহজ করে এনেছে জাপানীরা সেটা আমি জানতুম না। সেইদিনই সব-কিছু যোগাড় করে লেগে গেলুম কাজে। টেকনিকেল দুটো একটা সামান্য জিনিস ল্যাণ্ডলেডির করার ধরন থেকে অনায়াসে শিখে নিলুম। আর এ ব্যাপারে তো এই আমার পয়লা হাতেখড়ি নয়। আর কাপ, পটে আঁকার মত ছবির বিষয়বস্তু নিয়েও আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিল না।

মাল যখন সমূচা তৈরী হল, তখন কিছুটা দিলুম দোকানে, আর ঠেলা নিয়ে ফেরি করতে কার না শখ যায় ?

ভারতীয় বলে সর্বত্রই পেলুম অকৃপণ সৌজন্য ও সাহায্য। তুমি জানো কিনা জানি নে, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক ভবঘুরে জাপানী না জানি কি করে ভাসতে ভাসতে পৌঁছয় তোমাদের ঢাকা শহরে। ভাবতেই কি রকম মজা লাগে —দুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে ঢাকা। তবে ঐ চিরসবুজের দেশ—আমারও দেখা আছে—তাকে এমনি মুগ্ধ করলো যে, সে সেখানে একটা সাবানের কারখানা খুললো এবং শেষটায় একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়েও করলো। বাপ মাকে দেখাবার জন্য একবার নিয়ে গেল তার বউকে জাপানে। 'বুদ্ধের দেশের মেয়ে জাপানে এসেছে' খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। সেই অজ পাড়াগাঁ রাতারাতি হয়ে গেল জাপানের তীর্থভূমি। হাজার হাজার নরনারী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে কন্যার দর্শনাভিলাষে। ভাবো, মেয়েটার অবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে বসতে হল পদ্মাসনে, আর নতনম্র জাপানীদের লাইন তাকে প্রণাম করে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলো।'

আমি বললুম, 'মহিলাটি ঢাকায় ফিরে তাঁর জাপান-অভিজ্ঞতা বাঙলায় লেখেন, বড় সবিনয় ভাষায়। আমি পড়েছি। সে তো এলাহি ব্যাপার হয়েছিল।'

'হবে না ? আমার আমলে আমাদের রাসবিহারীবাবু ছিলেন জাপানীদের সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যে কেউ আসুক না কেন—এমন কি ইংরেজও—তার কাগজপত্র যেত ওঁর কাছে। তিনি 'না' বললে পত্রপাঠ আগন্তুকের জাপান ত্যাগ ছিল অনিবার্য। আর গুরুদেবের কাছ থেকে কেউ চিঠি নিয়ে এলে রাসবিহারীবাবু তাকে সমাজের সর্বোচ্চদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মদিনে তাঁর বাড়ি থেকে প্রসাদ বিতরণ হত —কিউ দাঁড়াতো মাইল দুয়েক লম্বা। সিঙাড়া না আমাদের দেশের কি একটা খাবার—জাপানীদের কাছে রোমান্টিক এবং হোলি।

আমি অবশ্য পারতপক্ষে মাতৃভূমির পরিচয় দিতুম না।

তবু বিক্রি হতে লাগলো প্রচুর। তার কারণ সরল। পাত্রের গায়ে অজানা ডিজাইন, নবীন ছবি—তা সে ভালো হোক আর মন্দই হোক—সকলেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য এনে দেয়। তারই ফলে আমি পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলুম। ফেরি-টেরি আর করি নে—নিতান্ত দু'মাসে ছ'মাসে এক আধ দিন—রোমান্সের জন্য। করে করে দু বছর কেটে গেল।

একদিন ঐ ঠেলা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আমি জিরোচ্ছি, এমন সময় এক থুরথুরে অতিবৃদ্ধ জাপানী খানদানী সামুরাই—অন্তত আমার তাই মনে হল—থমকে দাঁড়ালেন ঠেলার সামনে। কিন্তু এঁর মুখে দেখি তীব্র বিরক্তি। পুরু পরকলার ভিতর দিয়ে ক্ষণে তাকান আমার দিকে, ক্ষণে ঠেলার মালের দিকে। জাপানীরা অসহ্য রকমের অসম্ভব ভদ্র; অসন্তুষ্টি কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না। এঁর কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ যেন টুটে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'এসব কি? এসব কি করেছ? যাও, যাও, ওস্তাদ ওসিমার[১] কাছে। তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।' তার পর আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এ রকম সুরেলা গলা নিয়ে কি বিশ্রী বেসুরা গান!'

আমি বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। সত্যিই তো, আমি এ দু বছরে নূতন শিখেছি কি? কাদা কি করে তৈরী করতে হয় কিল্‌ন্‌ কি করে জ্বালাতে হয়—অন্য সব বাদ দিচ্ছি—কিছুই তো শিখি নি। দেশে ফিরলে ওগুলো আমায় করে দেবে কে? আর বাসনকোসনের শেপে, ছবিতে নিশ্চয়ই মারাত্মক ত্রুটি আছে, নইলে রাস্তার বুড়ো ওরকম খাপ্পা হল কেন?

চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো শান্তিনিকেতন মন্দিরে গুরুদেবের একটা সার্‌মনের কথা। সোনার পাত্রে সত্য লুকানো রয়েছে—সবাই পাত্র দেখে মুগ্ধ, ভিতরে হাত দিয়ে খোঁজে না, সত্য কোথায়। আমার হয়েছে তাই। এখানে কাঁচা পয়সা কামিয়ে আমি অবহেলা করেছি সেরামিকের নিগূঢ় তত্ত্ব।

কিন্তু আর না।

ওস্তাদ ওসিমা সম্বন্ধে খবর নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলুম না। তিনি বাস করেন এক অজ পাড়াগাঁয়ে, এবং গত দশ বছর ধরে কোনো শাগরেদ নিতে রাজী হন নি। তবে সবাই একবাক্যে বললেন, ওরকম গুণী এখন তো কেউ নেইই; সেরামিকের ইতিহাসেও কমই জন্মেছেন।

যা হয় হবে কুল-কপালে। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে, একফালি বিছানা আর একটি সুটকেস নিয়ে পৌঁছলুম সেই গাঁয়ে, খুঁজে বের করলুম ওস্তাদের বাড়ি।

জাপানী ভাষা কিন্তু আমি বাঙলার মত সুদ্ধু কান দিয়ে শিখি নি। প্রথম দিন থেকে রীতিমত ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে—তোমরা যে রকম আশ্রমে শাস্ত্রী

---

১ বর্তমান লেখক ওস্তাদের নাম ভুলে যাওয়াতে অন্যান্য কাল্পনিক নামের সঙ্গে ওসিমার আশ্রয় নিল।

মশায়ের কাছে সংস্কৃত—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

'ওস্তাদের ঘরে ঢুকে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অতিশয় বিনয়, ততোধিক বশ্যতা প্রকাশ করে তাঁর শিষ্য হওয়ার ভিক্ষা চাইলুম।

যেন বোমা ফাটলো ; 'বেরিয়ে যাও এক্ষুনি, বেরোও এখান থেকে।'

আমি ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম সত্যি, কিন্তু এরকম পদাঘাত প্রত্যাশা করি নি।

আরম্ভ করলুম কাকুতিমিনতি, সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, আমি হত্যে দেব ইত্যাদি। আর শুধু মাটিতে মাথা ঠেকাই।

অনেকক্ষণ পর তিনি অতিশয় শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন, "আমি কি করি না করি সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করি নে। তবু তোমাকে বলছি—বিদেশী বলে। আমার কাছে লোক এসে দু'চার মাস তালিম নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রটায় তারা আমার শিষ্য। কিছুই তারা শেখে নি—আর আমার নাম ভাঙিয়ে খায়। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনো শিষ্য নেব না"।'

আমি বললুম, 'নটরাজন, বরোদার ওস্তাদ গাওয়াইয়া ফইয়াজ খানও হুবহু ঠিক একই কারণে তাঁর জীবনের শেষের দিকে আর কোনো চেলা নিতেন না।'

নটরাজন বললে, 'ওঁদের দোষ দিই নে, কিন্তু আমার দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি আমার ওস্তাদকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ওরকম কোনো কুমতলব নিয়ে আসি নি। তিনি অটল অচল, নির্বাক।

কি আর করি! বারান্দায় গিয়ে বসে রইলুম বিছানাটার উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে—আমি না-ছোড়-বান্দা, জীবনমরণ আমার পণ।

ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন—আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি এক লম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে তাঁর চাকরকে খুঁজে বের করে বললুম, "দাদা, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি আমায় সাহায্য করো।" সে আগেই গুরুর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ শুনেছিল। তাকে বখশিশের লোভও দেখালুম। তার অনুমতি নিয়ে ওস্তাদের সব ক'খানা ঘরে লাগালুম ঝাঁট, ঝাড়াই-পোছাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে। গামলার জল পাল্টালুম, রঙতুলি গুছিয়ে রাখলুম, জামা-কিমোনো ভাঁজ করলুম, বিছানা দুরুস্ত করলুম। তারপর ফের বারান্দায়, বিছানার উপর। ওস্তাদ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে দরজার সামনে এক লহমার তরে একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু নির্বাক। এবার চাকরকে চায়ের হুকুম দিলেন।

আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলুম। ঘণ্টাখানেক পরে খেয়ে শুতে গেলেন। আমি গাঁয়ের যে একটি মাত্র খাবারের দোকান ছিল সেখানে শুঁটকি-ভাত খেয়ে এলুম। ওস্তাদ ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্য হাঁক দিতেই আমি রান্নাঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম এনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চা তৈরী করে কাপ এগিয়ে দিলুম। তিনি তখন আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে ভেজা পাত্রে ছবি আঁকছিলেন। পেয়ালা হাতে নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু নির্বাক। এরপর আমি রঙ গুলে দিতে লাগলুম। যাই বলো, যাই কও—আমিও আর্টিস্ট। কখন কোন্ রঙের দরকার হবে আগের থেকেই বুঝতে পারি। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নির্বাক।

সে রাত্রে আমি বারান্দাতেই ঘুমিয়েছিলুম। কিন্তু ঐ এক রাত্রিই।

ভোর থেকেই লেগে গেলুম চাকরের কাজে। তার পরের দিন। ফের পরের দিন। চাকরটা এখন আর তাঁর ঘরেই ঢোকে না। তিনি নির্বাক।

আমি দু বেলা হোটেলে গিয়ে শুঁটকি-ভাত খাই, আর রাত্রে চাকরের পাশে শুই।

বিশ্বাস করবে না, এই করে করে প্রায় একমাস গেল। তিনি নির্বাক।

মাসখানেক পরে একরাত্রে আমি আমার ইচ্ছা আর কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। যা দেখেছি সেইটে কাজে লাগাবার অদম্য কামনা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। অতি চুপিসাড়ে ওস্তাদের পটার্স হুইলের পাশে বসে একটা জাম-বাটি তৈরি করতে লাগলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ পিঠের উপর একটা বিরাশি সিক্কার কিল আর হুঙ্কার।

"কোন্ গর্দভ তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম ধারা বাটি ধরতে? কোন্ মর্কট তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম আঙুল চালাতে? প্রত্যেকটি জিনিস ভুল। যেন ইচ্ছে করে যেখানে যে ভুলটি করার সেটা মেহন্নত করে করে শিখেছ। হটো ইহাঁসে!"

গুরু প্রথম নিজে করলেন। কী বলবো ভাই, তাঁর দশটি আঙুল যেন দশটি নর্তকী। প্রত্যেকটির ফাংশন যেন ভিন্ন ভিন্ন, নাচে আপন আপন নাচ। তারপর আমাকে বসিয়ে আমার হাতে হাত ধরে শুরু করলেন গোড়ার থেকে। আর শুধু বলেন, "হা আমার অদৃষ্ট, এসব গলদ মেরামত করতে করতেই তো লেগে যাবে পাঁচটি বচ্ছর!"

এই আমার প্রথম পাঠ। ভোর অবধি চলেছিল।

সকালবেলা চা খেতে খেতে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ভুল প্র্যাকটিস যে কী

মারাত্মক হতে পারে তার কল্পনাও তোমার নেই। তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া, রঙ গোলা থেকে আমি অনুমান করেছিলুম তোমার হাত আছে, কিন্তু অসম্ভব খারাপ রেওয়াজ করে করে তার যে সর্বনাশ করে বসে আছো সেটা জানলে প্রথম দিনই পুলিস ডেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখি, কি করা যায়। এও আমার এক নতুন শিক্ষা! তোমাকে নেব দুই শর্তে। প্রথম, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার কাজ জনসাধারণকে দেখাতে পারবে না। দ্বিতীয়, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি শিক্ষা ক্ষান্ত দিয়ে পালাতে পারবে না।"

আমি বুদ্ধের নামে শপথ করলুম।

তারপর, ভাই, আরম্ভ হল আমার পিঠের উপর র‍্যাঁদা চালানো। একই কাজ একশ' বার করিয়েও তিনি তৃপ্ত হন না—আর মোস্ট্ এলিমেণ্টারি টাস্ক্। সঙ্গীতের উপমা দিয়ে বলতে পারি, এ যেন স্রেফ 'সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা ধা নি—'

আমি বললুম, 'বোমা পড়ে জাপানী!'

নটরাজন অবাক হয়ে বললে, 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'সিলেটে গত যুদ্ধে প্রথম জাপানী বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কবি রচেন,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমার মধ্যে কালো সাপ
বিটিশে কয় বাপ রে বাপ!'

নটরাজন বললে, 'আমার অবস্থা তখন ব্রিটিশের চেয়েও খারাপ। তারা তো পালিয়ে বেঁচেছিল, আমার যে পালাবারও উপায় নেই। তবে গুরু এখন বাঙ্ময়। চা খেতে খেতে, বেড়াতে যেতে যেতে ফাইয়াঁস-পর্সেলিনের গুহ্যতম তত্ত্ব বোঝাতেন, কিন্তু রেওয়াজের বেলা সেই প্রাণঘাতী সা রে গা মা।

পাক্কা দেড়টি বছর পরে পেলুম দ্বিতীয় পাঠ!

ইতিমধ্যে দেখি, এ-দেশের ব্যাপারটাই আলাদা! অনেক দিন একটানা পাত্র গড়ে তার উপর ছবি এঁকে যখন এক ডাঁই তৈরী হল তখন গুরু কিল্‌নে সেগুলো ঢুকিয়ে করলেন 'ফায়ারিং'। ইতিমধ্যে পটারির সমঝদারদের কাছে নিমন্ত্রণ গেছে, অমুক দিন অমুকটার সময় তাঁর পটারির প্রদর্শনী। ঢাউস ঢাউস মোটর চড়ে, গ্রাম্যপথ সচকিত করে এলেন লক্ষপতিরা। তাঁরা চা খেলেন। সার্ভ করলুম। সবাই ভাবলেন আমি বিদেশী চাকর। একজন একটু কৌতূহল

দেখিয়েছিলেন, গুরু সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ করলেন। তার পর ওঁদের সামনেই কিল্‌ন্‌ থেকে পটারি বের করা হল। পাঁচ শ থেকে আরম্ভ করে, এক এক সেট্‌ দু'হাজার তিন হাজার টাকায় সব—সব বিক্রি হয়ে গেল। দেশে, বিলেতে মানুষ যে রকম ছবি, মূর্তি কিনে নিয়ে আপন কলেক্‌শন বানায়।

তার পর আস্তে আস্তে অনুমতি পেলুম পাত্রের গায়ে ছবি আঁকবার। পুরো এক বছর ধরে পাত্র গড়ি, ছবি আঁকি কিন্তু কিল্‌নে ঢোকবার অনুমতি পাই নে। ভেঙে ফেলতে হয় সব। সে কী গর্ব্বযন্ত্রণা!

এমন সময় এল গুরুর আরেকটা প্রদর্শনী। আমি গোপনে গুরুর ভাঁইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাপ এক কোণে রেখে দিলুম। ডিজাইন দিয়েছিলুম পার্শিয়ান। আমাদের দেশে তো সেরামিকের ঐতিহ্য নেই, আর পার্শিয়ান ডিজাইন জাপানে প্রায় অজানা।

চায়ের পর কিল্‌ন্‌ খোলার সময় প্রায় একই সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়ে গেল আমার কাপটার উপর। আমি আশা করেছিলুম ওটা আমি গোপনে সরিয়ে নিতে পারবো। আমি তখন ছোঁ মেরে সেটা সরিয়ে করলুম পলায়ন। ওঁদের ভিতর তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আমার কাপ নিয়ে নীলাম। গুরু বসবার ঘরে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে কাপটি রাখলুম। তখন তাঁরা বুঝলেন, এটা কার কাজ। গুরু স্মিত হাস্যে ওঁদের সবকিছু বয়ান করে বললেন, "শিগগিরই ওর আপন প্রদর্শনী হবে। আপনারা কে কি চান অর্ডার দিয়ে যান।"

ওরা চলে গেলে আমি সব বুঝিয়ে গুরুর কাছে মাফ চাইলুম। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, "দু-চার মাসের ভিতর এমনিতেই হ'ত। তোমাকে কিছু বলি নি।"

আমি কাজে লেগে গেলুম। গুরু আপন কাজ বন্ধ করে দিয়ে পই পই করে তদারকি করলেন আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা অঙ্গুলিচালনা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বেরুলো তাঁর নামে। আমার প্রথম প্রদর্শনী। গুরু বললেন, "তোমার একটা ফটো ছেপে দাও চিঠিতে।"

নটরাজন বললে, 'দাঁড়াও, সে চিঠির একটা কপি বোধহয় বউয়ের কাছে আছে।' তাঁকে স্মরণ করা হলে তিনি নিয়ে এলেন একটা এ্যালবাম্‌। তাতে মেলা প্রেস-কাটিংস। নটরাজনের প্রদর্শনীর রিভিউ। নিমন্ত্রণপত্রে তাজ্জব হয়ে দেখি ফটোতে নটরাজনের মাথায় খাস পাঠান পাগড়ি! আমি বললুম, 'এ কি?' বললে, 'ভাই, জাপানীরা ঐ পাগড়িটাই চেনে। ওঠা হলেই ইণ্ডিয়ান!'

আমি শুধালুম, 'তারপর!'

'প্রদর্শনী হল। গুরু ময়ূরটার মত প্যাখম তুলে ঘোরাঘুরি করলেন। বেবাক্ মাল বিক্রি হয়ে গেল। কাঁড়া কাঁড়া টাকা পেলুম। কাগজে কাগজে রিভিউ বেরুলো।'

নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'তিনি জাপানের অন্যতম সেরা আর্টিস্ট বলে স্বীকৃত হলেন।'

নটরাজন বললে, 'সে সব পরে হবে। আমার মস্তকে কিন্তু সাতদিন পরে সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত। চাঁদের আলোতে ঝরনাতলায় চুকচুক করে সাকে খেতে খেতে গুরু বললেন, "এইবারে বৎস, তোমার ছুটি। টোকিওতে গিয়ে আপন পসরা মেলো।"

আমি আর্তকণ্ঠে বললুম, "গুরুদেব, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।"

গুরু বললেন, "বৎস, শেখার তো শেষ নেই। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তালিম নেবার একটা শেষ থাকে। তোমাদের ইস্কুল-কলেজেও তো শেষ উপাধি দিয়ে বিদায় দেয়। তখন কি আর গুরু শোনে তোমার মিনতি যে, তোমার কিছুই শেখা হয় নি? আমি যে সব হুনর্ পুরুষানুক্রমে পেয়েছি তার প্রত্যেকটি তোমাকে শিখিয়েছি। এবারে আরম্ভ করো সাধনা।"

আমার সব অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হল। বললেন, "মাঝে মাঝে এসো; তোমার কাজ দেখে আলোচনা করবো। নির্দেশ দেবো না, আলোচনা করবো।"

আমি পরের দিন আমার সঞ্চয়ের সব অর্থ গুরুর পদপ্রান্তে রাখলুম—গুরুদক্ষিণা। তিনি একটি কড়িও স্পর্শ করলেন না। অনেক চেষ্টা দিলুম। আবার তিনি নির্বাক! সেই প্রথম দিনের মত।'

বেশ খানিকক্ষণ কি যেন একটা ভেবে নিয়ে নটরাজন বললে, 'এর সঙ্গে কিন্তু একটা সাইড-ড্রামাও আছে।'

'সেটা কি?'

মুচকি হেসে বললে, 'তাঁর কন্যার—'

মিসেস উঠে বললেন, 'আমি চললুম।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

নটরাজন বললে, 'তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের অনুমতি চাইলুম।'

আমি বললুম, 'সে কি! এর তো কিছু বলো নি!'

'বললুম তো, সে অন্য নাট্য। আরেক দিন বলবো।'

'গুরু কি বললেন?'

'দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন "আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না যে আমার গুণী মেয়ে কোনো আনাড়ির হাতে পড়ে, যে সেরামিকের রস জানে না। তোমরা দুজনাতে আমার ঘরানা বাঁচিয়ে রাখবে, সমৃদ্ধ করবে।" আমার স্ত্রী সত্যি ভালো কাজ করতে পারে।'

* * *

পরের দিন শুধালুম, 'দেশে ফিরে কি করলে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি জানতুম এদেশে অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন। কাদা-কিল্‌নের কথা বাদ দাও, আমার হ্যাণ্ডপেণ্টেড অরিজিনাল জিনিস পাঁচশ' হাজার টাকা দিয়ে কিনবে কে ? এদেশে তো এসব কেউ জানে না,—ভাববে আমি পাগল, একটা টী-সেটের জন্য পাঁচশ' টাকা চাইছি। এদেশে জাপানী ক্রকারি আসে মেশিনে তৈরী মাস্‌-প্রোডাকশন্‌। আমার তো প্রতি মাসে অন্তত সাতশ, হাজার টাকা চাই। জাপানে প্রতি মাসে পাঁচ-সাত হাজারও কামিয়েছি।'

আমি বললুম, 'এ কী ট্রাজেডি ! যা শিখলে তার সাধনা করতে পেলে না ?'

হেসে বললে, 'আমি কি পয়লা না শেষ ? বিদেশ থেকে উত্তম সায়ান্স শিখে এসে কত পণ্ডিত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে শুকিয়ে মরে ! আর যারা ছবি আঁকে ? তাদেরই বা ক'জনের অন্ন জোটে ? তাই একটা চাকরি নিয়েছি—দেখি, অবসর সময়ে যদি কিছু—'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম, 'তোমার চাকরিটা তো ভালো। তোমাদের সেরামিক ফ্যাক্টরি শুনেছি, ভারতের সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশী টেম্পারেচর তুলতে পারো তোমাদের কিল্‌নে।'

অট্টহাস্য করে নটরাজন বললে, 'ইন্‌সুলেটার ! ইন্‌সুলেটার ! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ! টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথায় সাদা মুণ্ডুটা দেখেছ ? আমরা বানাই সেই মাল। অষ্টপ্রহর তাই বানিয়েও বাজারের খাঁই মেটাতে পারি নে। কোম্পানির ওতেই লাভ, ওতেই মুনাফা। আর দয়া করে ভুলো না, হরেক রকম ইন্‌সুলেটর সেরামিক পর্যায়েই পড়ে ! হা-হা হা-হা, যেমন দেয়ালে যে রঙ লাগায় সেও পেণ্টার, অবন ঠাকুরও পেণ্টার !'

ইন্‌সুলেটার হে, ইন্‌সুলেটার !!

বুড়ো-বুড়ী

'চিঠি নাকি, বাবাজী আজান ?'

'বিলক্ষণ, মসিয়ো···প্যারিস থেকে এসেছে।'

চিঠিখানি যে খুদ প্যারিস থেকে এসেছে তাই নিয়ে সাদা-দিল্ বাবাজী আজানের চিত্তে রীতিমত দেমাক।···কিন্তু আমার না। কে যেন আমায় বলে দিচ্ছিল, এই যে জ্যাঁ জাক্ রুসো সরণীর প্যারসিনী বলা নেই কওয়া নেই, সাত সকালে হঠাৎ আমার টেবিলের উপর এসে অবতীর্ণ হলেন, ইনি আমার পুরো দিনটারই সর্বনাশ করবেন। ঠিক। ভুল করি নি : বিশ্বেস না হয় দেখুন :

'আমার একটু উপকার করতে হবে, দোস্ত। তোকে এক দিনের তরে তোর ময়দা-কল বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে এইগুইয়ের যেতে হবে···এইগুইয়ের বড় গণ্ডগ্রাম, তোর ওখান থেকে পাঁচ ছ কোশ—কিচ্ছু না, বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যাবি। পৌঁছে অনাথাশ্রমের খোঁজ নিবি। আশ্রমের ঠিক পরের বাড়িটা একটু নিচু, জানলা-খড়খড়ি ছাই-রঙা, বাড়ির পিছনভাগে একটুখানি বাগান। কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়বি,—দরজা হামেহাল খোলা থাকে—আর ঘরে ঢুকেই আচ্ছা জোরসে চেঁচিয়ে বলবি, "সজ্জনদের পেন্নাম জানাই! আমি মরিসের বন্ধু···" তখন দেখতে পাবি এক মুঠো সাইজের ছোট্ট একজোড়া বুড়ো-বুড়ী, ওঃ! সে কী বুড়ো! বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো, আদ্যিকালের বুড়ো-বুড়ী তাঁদের বিরাট আরাম কেদারার গর্ত থেকে তোর দিকে হাত তুলে ধরবেন, আর তুই তখন তাঁদের আমার হয়ে আলিঙ্গন করবি, চুমো খাবি, তোর সর্ব হৃদয় দিয়ে, যেন ওঁরা তোরই। তার পর সবাই মিলে গাল-গল্প আরম্ভ হবে ; ওঁনরা সুদ্দু আমার সম্বন্ধেই কথা কইবেন, আর কিচ্ছুটি না, সুদ্দু আমার কথা ; হাজার হাজার আবোল-তাবোল বকে যাবেন, তুই কিন্তু হাসবি নি···হাসবি নি কিন্তু, বুঝেছিস ?···এঁরা আমার ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, ওঁদের আগাপাস্তলা প্রাণ একমাত্র আমি—এবং আমাকে দশ বছর হল দেখেন নি···দশ বছর—দীর্ঘকাল! কিন্তু করি কি বল্! আমি—প্যারিস আমাকে জাবড়ে ধরে আছে ; ওঁদের ? ওঁদের আটকে রেখেছে বুড়ো বয়স··· এঁদের যা বয়স, আমাকে দেখবার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে চালানী মালের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন···কিন্তু আমার কপাল ভালো, তুই তো ভাই, হোথায় আছিস, বেরাদর আমার, ময়দাকলের মালিক[১]—তোকে আদর-প্যার করে

---

১ আসলে দোদে নির্জনে বাস করার জন্য একটি অতিবৃদ্ধ পরিত্যক্ত মিল ভাড়া করেছিলেন, প্রায় বিনামূল্যে।

বেচারী বুড়ো-বুড়ীরা আনন্দ পাবে, যেন আমারই এ্যাট্টুখানিকে চুমো-চামা খাচ্ছে…আমি অনেক বার আমাদের কথা ওঁদের বলেছি, এবং আমাদের গভীর বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও, যেটি কি না……'

জাহান্নামে যাক বন্ধুত্ব! ঠিক আজকের সকালটাতেই আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার, কিন্তু বাউণ্ডুলের মত যত্র-তত্র চর্কিবাজি খাওয়ার মত আদপেই নয়। একে তো বইছে জোর হাওয়া, তদুপরি রৌদ্রটিও চড়চড়ে কড়া—প্রভাঁস অঞ্চলের খাঁটি দিন যাকে বলে। আমি ঠিক করে বসেছিলুম, দুটি পাহাড়ের টিপির মধ্যিখানে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেব হুবহু একটি গিরগিটির মত, সূর্যালোক পান করতে করতে আর পাইন গাছের মর্মর গান শুনতে শুনতে—এমন সময় এল ঐ লক্ষ্মীছাড়া চিঠিটা…কিন্তু করা যায় কি কও? মিল্‌টা বন্ধ করলুম অভিসম্পাত দিতে দিতে, চাবিটা রেখে দিলুম বেরালটার আসা-যাওয়ার ছোট্ট গর্তটার ভিতর। লাঠিটা, পাইপটি—ব্যস্, নাবলুম রাস্তায়।

বেলা প্রায় দু'টোর সময় পৌঁছলুম এইগুইয়েরে। গাঁটা খাঁ খাঁ করছে, সবাই খেত-খামারে। ধুলোয় ঢাকা এল্‌ম্ গাছে ঝিল্লি ঝিঁঝিঁ করছে যেন নির্জন খোলামাঠের মধ্যিখানে। অবিশ্যি সরকারী বাড়িটার সামনের চত্বরে একটা গাধা রোদ পোয়াচ্ছিল বটে, আর গির্জের সামনের ফোয়ারায় একপাল পায়রাও ছিল, কিন্তু অনাথাশ্রমটি দেখিয়ে দেবার মত কেউই ছিল না। কিন্তু কপাল ভালো, হঠাৎ আমার সামনে যেন পরীর মত আত্মপ্রকাশ করলে এক বুড়ী। ঘরের সামনের এক কোণে উপু হয়ে বসে চরকা কাটছিল। শুধালুম তাকে। আর পরীটিরও ছিল দৈবীশক্তি। কড়ে আঙ্গুলটি তুলে দেখাতে না-দেখাতে তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে যেন মন্ত্রবলে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো অনাথাশ্রমটি!…বিরাট, ভারিক্কি, কালো কুঠিবাড়ি। বেশ দেমাকের সঙ্গে তার দেউড়ির উপরের পাঁশুটে লাল রঙের প্রাচীন দিনের ক্রুশ—চতুর্দিকে আবার দু'ছত্তর লাতিনও দেখিয়ে দিচ্ছে! ঐ বাড়িটার পাশেই দেখতে পেলুম আরেকটি ছোট্ট বাড়ি। ছাইরঙের খড়খড়ি, পিছনে ছোট্ট বাগানটি…তদ্দণ্ডেই চিনে গেলুম, কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়লুম।

আমার বাকী জীবন ধরে আমি সেই দীর্ঘ করিডরটি দেখব; মন্দ-মধুর ঠাণ্ডা, শান্ত-প্রশান্ত, দেয়ালগুলো গোলাপী রঙের, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি বাগানটি যেন স্বচ্ছ রৌদ্রালোকে অল্প অল্প কাঁপছে, আর শার্সিগুলোর উপর ফুলপাতায় জড়ানো বেহালার ছবি আঁকা। আমার মনে হল আমি সেদেন্ যুগের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দরবারখানায় পৌঁছে গিয়েছি।…করিডরের শেষপ্রান্তে, ডানদিকে, আধ-

ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে আসছে দেয়াল-ঘড়ির টিক্-টাক্ শব্দ, আর একটি শিশু—ইস্কুলের বাচ্চার গলার শব্দে—প্রতি শব্দে থেমে থেমে পড়ছে : ত—খন··· সেণ্ট···ইরেনে[২]···চিৎকা···র···করে···বললেন···আমি···প্রভুর···যেন···গম··· শস্য···আমাকে···ময়দা···হতে···হয়ে···ঐ···সব···পশুদের···দাঁতের···পিষণে···। আমি ধীরে ধীরে মৃদু পদে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালুম।

শান্ত, অর্ধ দিবালোকে, ছোট্ট একটি কামরার ভিতর, গভীর একটা আরাম-কেদারার ভিতর ঘুমুচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধ। গোলাপী ছোট্ট দুটি গাল, আঙুলের ডগা অবধি সর্ব শরীরের চামড়া কোঁচকানো, মুখ খোলা, হাত দুটি দু' জানুর উপর পাতা। তাঁর পায়ের কাছে নীল পোশাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে—মাথায় নান্‌দের মত টুপি, অনাথাশ্রমের মেয়েদের পোশাক পরা—সাধ্বী ইরেনের জীবনী পড়ছে—বইখানা আকারে তার চাইতেও বড়। এই অলৌকিক পুরাণ পাঠ যেন সমস্ত বাড়িটার উপর ক্রিয়া চালিয়েছে। বৃদ্ধ ঘুমুচ্ছেন তাঁর আরাম-কেদারায়, মাছিগুলো ছাতে, ক্যানারি পাখিগুলো এই হোথায় জানলার উপরে তাদের খাঁচায়। প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটা নাক ডাকাচ্ছে—টিক্, টাক্, টিক্, টাক্। সমস্ত ঘরটাতে কেউই জেগে নেই—সুদ্দু মাত্র খড়খড়ির ভিতর যে একফালি সাদা, সোজা আলো এসে পড়েছে তার ভিতর ভর্তি জীবন্ত রশ্মি-কণা—তারা নাচছে তাদের পরমাণু নৃত্যের চক্রাকারের ওয়াল্‌ট্‌স্···এই ঘরজোড়া তন্দ্রালসের মাঝখানে সেই মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে : সঙ্গে···সঙ্গে···দুটো···সিংহ···লাফ···দিয়ে···পড়ল···তাঁর···উপর··· এবং···তাঁকে···উদর···সাৎ···করে···ফেলল···ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমি ঘরে ঢুকলুম। স্বয়ং সেণ্ট ইরেনের সিংহ দুটোও ঐ সময়ে সে-ঘরে ঢুকলে এতখানি বিহ্বলতার স্তম্ভন সৃষ্টি করতে পারতো না। সে-যেন রীতিমত নাটকীয় আচমকা আবির্ভাব! বাচ্চাটা ডুকরে উঠলো, বিরাট কেতাবখানা পড়ে গেল, ক্যানারি পাখিগুলো জেগে উঠলো, দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠলো, বুড়ো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন—একেবারে হকচকিয়ে গেছেন—আর আমিও কেমন যেন বোকা বনে গিয়ে চৌকাঠে থমকে গিয়ে বেশ একটু জোর গলায় বলে উঠলুম :

'সুপ্রভাত, সজ্জনগণ! আমি মরিসের বন্ধু!'

---

২ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আহা! আপনারা যদি তখন তাঁকে দেখতে পেতেন—যদি দেখতে পেতেন, বেচারী বুড়োকে দেখতে পেতেন! দুই বাহু প্রসারিত করে আমাকে আলিঙ্গন করতে, আমার হাত দুখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে এগিয়ে এলেন, আর ঘরময় উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে শুধু বলেন,

'হে দয়াময়, হে দয়াময়!'...

তাঁর মুখের সব কোঁচকানো চামড়া হাসিতে ভরে উঠেছে। আর তোতলাচ্ছেন,

'আ মসিয়ো,...আ মসিয়ো...'

তার পর কামরার শেষ প্রান্তে ডাক দিতে দিতে গেলেন:

'মামেৎ!'

একটা দরজা খুলে গেল। করিডরে যেন একটা ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা গেল...ঐ যে মামেৎ! ঐ এক ফোঁটা বুড়ী—কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল—মাথায় গিঁট বাঁধানো বনেট্, পরনে কারমেলিট নান্‌দের ফিকে বাদামী রঙের পোশাক, হাতে নক্‌শা-কাটা রুমাল—আমাকে সেই প্রাচীন দিনের কায়দায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে...ওঁদের দেখলেই কিন্তু বুকটা দরদে ভরে আসে, দুজনারই চেহারা একই রকমের! বুড়োর মাথার চুল বদলে দিয়ে বুড়ীর বনেট্ তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে তাঁকেও মামেৎ নাম দেওয়া যেত!...শুধু সত্যিকার মামেৎকে নিশ্চয়ই তাঁর জীবনে চোখের জল ফেলতে হয়েছে অনেক বেশী, আর তাঁর সর্বাঙ্গের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে আরো বেশী। বুড়োর মত ওঁরও সঙ্গে অনাথাশ্রমের একটি ছোট্ট মেয়ে, পরনে অন্য মেয়েটার মতই পোশাক, বুড়ীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, কক্‌খনো তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না—অনাথাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত দুটি বাচ্চা মেয়ে এই দুই বুড়ো-বুড়ীকে যেন আশ্রয় দিয়ে রক্ষণ করছে—এর চেয়ে হৃদয়স্পর্শী যেন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বুড়ী আমাকে গভীর সম্মান-অভিবাদন জানাতে আরম্ভ করছিলেন, কিন্তু বুড়ো একটি শব্দ দিয়েই তাঁর সসম্মান-অভিবাদন কেটে দু'-টুকরো করে ফেললেন:

'এ তো মরিসের বন্ধু...'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী কাঁপতে লাগলেন, কেঁদে ফেললেন, রুমালখানা হারিয়ে ফেললেন, মুখ রাঙা হয়ে গেল, টকটকে লাল, বুড়োর চেয়েও বেশী লাল...হায়, বুড়ো-বুড়ী! এঁদের সর্ব শিরায় আছে মাত্র একটি ফোঁটা রক্ত, আর সামান্যতম অনুভূতির পরশ লাগলেই সেই ফোঁটাটি মুখে এসে পৌঁছে যায়।

'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির—চেয়ার নিয়ে এস'…বুড়ী তাঁর বাচ্চাটিকে বললেন।

'জানলাটা খুলে দাও'—বুড়ো তাঁর বাচ্চাটিকে হুকুম দিলেন।

তার পর দু'জনাতে আমার দু' বাহু ধরে খুট খুট করে হেঁটে নিয়ে চললেন জানলার কাছে। সেটা পুরো খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওঁরা আমাকে আরো ভালো করে দেখতে পান। আমরা এগিয়ে গেলুম আরাম-কেদারার কাছে। আমি বসলুম তাঁদের দুজনার মাঝখানে চেয়ারে। মেয়ে দুটি আমাদের পিছনে। তার পর আরম্ভ হল সওয়াল :

'কি রকম আছে সে? কি করে সে? এখানে আসে না কেন? সুখে আছে তো? ·'

এটা, ওটা, সেটা—কত শত কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আর আমি? তাঁরা আমার বন্ধুবাবদে যে সব প্রশ্ন শুধোচ্ছিলেন সেগুলোর উত্তর আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তো দিলুমই—যেগুলো জানা ছিল; আর যেগুলো জানা ছিল না সেগুলো নির্লজ্জভাবে বানিয়ে বানিয়ে। আর বিশেষভাবে অবশ্যই কিছুতেই স্বীকার করলুম না যে তার ঘরের জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয় কি না সেটা যে আমি লক্ষ্য করি নি, কিংবা তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের!

'তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের?…নীল রঙের ঠাকুমা, হাল্কা নীল—আসমানী রঙের—ফুলের মালার ছবি আঁকা।…'

'—তাই না?' বুড়ী একবারে গদ্‌গদ। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সোনার চাঁদ ছেলেটি!'

বুড়ো সোৎসাহে যোগ দিলেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে।'

আর আমি যতক্ষণ কথা বলছিলুম, তাঁরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষণে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন, ক্ষণে সামান্য স্মিতহাস্য করছিলেন, ক্ষণে চোখে চোখে ঠার মারছিলেন, ক্ষণে একে অন্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন—কিংবা বুড়ো আমার একটু কাছে এসে আমায় বলেন,

'আরেকটু জোরে কও…ভালো করে শুনতে পায় না ও।'

আর উনিও, 'আরেকটু চেঁচিয়ে, লক্ষ্মীটি!…উনি সব কথা ভালো করে শুনতে পান না…'

আমি তখন গলাটা একটু চড়াই; দুজনাই তখন একটুখানি স্মিতহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ জানান। আর তাঁদের সেই হাল্কা ফিকে স্মিতহাস্যভরা দৃষ্টি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁরা যেন আমার চোখের নিভৃততম গভীরে খুঁজে

দেখবার চেষ্টা করেন তাঁদের মরিসের ছবি ; আর আমার হৃদয়ও যেন আমার বন্ধুর ছবি তাঁদের চোখে দেখে একেবারে গলে যায়—আবছা-আবছা, ঘোমটা-ঢাকা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেন অনেক দূরের থেকে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

* * *

হঠাৎ বুড়ো তাঁর আরাম-কেদারার গভীর থেকে হকচকিয়ে উঠলেন :

'আমার কি মনে পড়লো, মামেৎ…সে বোধহয় এখনো দুপুরের খাবার খায় নি !'

আর মামেৎ আর্ত হয়ে শূন্যে তুলে দিয়েছেন হাত দুখানা :

'এখনো খায় নি !…হে দয়াময়, হে ভগবান !'

আমি ভাবলুম, এখনও বুঝি মরিসের কথাই হচ্ছে ; তাই তাঁদের বললুম যে, তাঁদের যাদু মরিস দুপুর হতে না হতেই খানার টেবিলে বসে যায়—তার চেয়ে দেরি সে কস্মিনকালেও করে না। কিন্তু না, এবারে উঠেছে আমার কথা। আর আমি যখন স্বীকার করলুম যে আমি তখনো খাই নি, তখন যে ধুন্দুমার আরম্ভ হল সেটা সত্যি দেখবার মত।

'শিগ্‌গির শিগ্‌গির নিয়ে এসো। ছুরি কাঁটা সব—ও বাচ্চারা! টেবিলটা ঘরের মধ্যিখানে নিয়ে এস। রবারের টেবিলক্লথ, ফুলের নক্সাদার বাসন-প্লেটগুলো! আঁর অত হাসাহাসি না করলেও আমাদের চলবে, বুঝলে! আর জল্‌দি, জল্‌দি, প্লীজ !'

আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, তারা জলদি জলদিই করেছিল! তিনখানা পেলেট ভাঙতে যতখানি সময় লাগার কথা তার পূর্বেই টেবিল, খাবার-দাবার, সব তৈরী।

'সামান্য একটু ভালো-মন্দ নাশতা বই আর কিছু নয়'—আমাকে টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মামেৎ বললেন। 'শুধু তোমাকে একলা-একলিই খেতে হবে। আমরা ? আমরা সকাল বেলাই খেয়ে নিয়েছি।'

বেচারা বুড়ো-বুড়ী! যে কোনো সময়েই ওঁদের শুধোও না কেন, ওঁদের সব সময়েই ঐ এক উত্তর, তাঁরা সকাল সকালই খেয়ে নিয়েছেন।

মামেতের দেওয়া নাশ্‌তা—দুধ, খেজুর আর একখানা আস্ত 'পাই' ; ঐ দিয়ে কিন্তু মামেৎ আর তার ক্যানারি পাখীগুলোর নিদেন আটদিনের খাওয়া-দাওয়া চলে যায়…তাই ভাবো দিকি নি, আমি একাই তাবৎ মালের শেষ কণাটুকু খেয়ে ফেললুম!…আর টেবিলের চতুর্দিকে সে কী 'কেলেঙ্কারি'! ক্ষুদে দুই

নীলাম্বরী একে অন্যকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিস্‌ফিস্ করছিল, আর খাঁচার ভিতরে ক্যানারিগুলোর ভাব, যেন মনে মনে বলছে, 'দেখেছ! এ কেমন ভদ্রলোক! গোটা পাইটাই খেয়ে ফেললে!'

কথাটা সত্যি। আমি প্রায় সমস্তটাই বেখেয়ালে খেয়ে ফেলেছি—কারণ আমি তখন ঐ শান্ত শীতল ঘরটার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে কেমন যেন প্রাচীন দিনের সৌরভ ভাসছিল···বিশেষ করে দুটি ছোট্ট খাট থেকে আমি আমার চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলুম না। প্রায় যেন ছোট্ট দুটি শিশুদের দোলনা। আমি কল্পনা করতে লাগলুম—সকালে, অতি ভোরে বুড়ো-বুড়ী ঝালর-লাগানো পর্দাঘেরা খাটের গভীরে শুয়ে। ভোর তিনটে বাজলো। ঐটেই সব বুড়ো-বুড়ীর জেগে ওঠার সময়।

—ঘুমুচ্ছো, মামেৎ?

—না গো।

—কি বলো, মরিস ছেলেটি বড় লক্ষ্মী—না?

—সে আর বলতে, বড্ড লক্ষ্মী ছেলে!

আর সুদ্ধমাত্র একটির পাশে আরেকটি, বুড়ো-বুড়ীর ছোট্ট দুটি খাট দেখে আমি ওদের দুজনার মধ্যে পুরোপুরি একটি কথাবার্তা কল্পনা করে নিলুম···

ইতিমধ্যে ঘরের অন্যপ্রান্তে, আলমারির সামনে একটা ভীষণ নাটকের অভিনয় চলছিল। ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঐ আলমারির সবচেয়ে উপরের থাকে রয়েছে এক বোয়াম লিক্যোর-ব্রাণ্ডিতে মজানো চেরি। এটা দশ বৎসর ধরে মরিসের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন সেটাকে নামাতে হবে যাতে করে আমি এটার উন্মোচন-পর্ব সমাধা করতে পারি। মামেতের সর্ব অনুনয় উপেক্ষা করে বুড়ো স্বয়ং লেগে গেছেন সেটাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। ভয়ে আড়ষ্ট বউ—আর উনি একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছেন সেটাকে পাড়তে··· পাঠক, যেখানে আছো সেখান থেকেই ছবিটি দেখতে পাবে: বুড়ো কাঁপছেন, ঝুলে পড়ে লম্বা হবার চেষ্টা করছেন, ক্ষুদে নীলাম্বরী মেয়ে দুটি চেয়ারটাকে জাবড়ে ধরে আছে। পিছনে মামেৎ হাঁপাচ্ছেন—হাত দুটি দু'দিকে মেলে ধরেছেন, আর এ সব-কিছুর উপর ভাসছে মৃদু সুগন্ধি নেবুর সৌরভ খোলা আলমারির ভিতর থেকে, থাকে থাকে সাজানো কাপড়ের ডাঁই থেকে।

অবশেষে, অশেষ মেহন্নতের পর, সেই সুপ্রসিদ্ধ বোয়ামটি আলমারি থেকে বের করা হল, আর তার সঙ্গে টোলে টোলে ভর্তি একটি রুপোর 'মগ'-পারা গেলাস—মরিস যখন ছোট্ট ছিল সেই আমলের। গেলাসটি চেরি দিয়ে আমার

জন্য কানায় কানায় ভর্তি করা হল; মরিস এই চেরি খেতে কতই না ভালোবাসতো! চেরি আর ব্রাণ্ডি ভরতে ভরতে বুড়ো খুশ-খানা-সমঝদারের মত আমার কানে কানে বললেন:

—'বুঝলে হে, তোমার কপাল ভালোই বলতে হবে, হ্যাঁ, তোমার কথাই কইছি, এখন যা খাবে…আমার গিন্নীই এটি তৈরী করেছেন…খাসা জিনিস খাবে এখন।'

হায়রে কপাল! ওঁর গিন্নী এটি তৈরী করেছেন সত্যি, কিন্তু চিনি দিতে গেছেন বেবাক ভুলে! তা আর কি করা যায় বলো! বুড়ো বয়সে কি আর মানুষের সবকিছু মনে থাকে! বেচারী মামেৎ আমার, সত্যি বলতে কি তোমার চেরিগুলো অখাদ্যের একশেষ; হলে কি হয়, আমি চোখের পাতাটি পর্যন্ত না নাড়িয়ে তলানি অবধি সাফ করে দিলুম।

* * *

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ালুম ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। ওঁরা অবশ্যি সত্যই খুশী হতেন যদি আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতুম, যাতে করে ওঁরা লক্ষ্মী ছেলে মরিস সম্বন্ধে আরো কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেলা তখন ঢলে পড়েছে, মিলটাও দূরে—বিদায় নিতেই হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

'—মামেৎ, আমার কোটটা!…আমি ওকে চত্বর অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সত্যি বলতে কি, মামেৎ মনে মনে দ্বিধা বোধ করছিলেন, বেশ একটু শীত পড়েছে, এ সময় আমাকে চত্বর অবধি পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না; কিন্তু সেটা মুখের ভাবে প্রকাশ করলেন না। শুধু শুনতে পেলুম, ঝিনুকের বোতামওলা, সোনালি নস্যি রঙের চমৎকার ফ্রক্-কোটটি পরিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী ঠাকুরমাটি কর্তাকে নিচু গলায় শুধোলেন,

'তোমার ফিরতে দেরি হবে না তো?—কেমন?'

বুড়ো একটু দুষ্টুমির মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'—হেঁ, হেঁ!…কি জানি…হয় তো বা…'[৩]

---

৩ যৌবনে যে ফুর্তিফার্তি করতে গিয়ে আর পাঁচজনের মত মাঝে-মধ্যে দেরিতে বাড়িতে ফিরতেন, মামেৎ বকাঝকা করতেন, এটাতে ঠাট্টা করে তারই ইঙ্গিত।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ওঁদের হাসতে দেখে বাচ্চা দুটি হাসলে, আর খাঁচার কোণে বসে ক্যানারি দুটোও তাদের আপন ঢঙে হাসলে···নিতান্ত তোমাকেই বলছি, পাঠক, আমার মনে সন্দ হয়, ঐ চেরি-ব্রাণ্ডির গন্ধে ওরা সবাই বোধহয় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরদা আর আমি যখন রাস্তায় নামলুম তখন অন্ধকার হব-হব। একটু দূরের থেকে পিছনে পিছনে নীলপোশাকী ছোট্ট মেয়েটি আসছিল ওঁকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য—বুড়ো ওকে দেখতেও পান নি। তিনি সগর্বে আমার বাহু ধরে চলছিলেন যেন কতই না শক্তসমর্থ মদ্দা জোয়ান। মামেৎ ভরপুর হাসিমুখে দোরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে খুশীতে মাথা নাড়ছিলেন যেন ভাবখানা এই 'যা-ই বলো, যা-ই কও,—আমার বুড়া এখনও তো দিব্য চলাফেরা করতে পারে।'[৪]

কোষ্ঠী-বিচার

আমি তো রেগে টং।

মুসলমান বাড়িতে সচরাচর গণৎকার আসে না, যদিও শুনেছি ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান, হিটলারের মত কট্টর বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা নাকি রাশিকুণ্ডলী মাঝে-মধ্যে দেখে নিতেন। আমাদের বাড়িতে গণৎকার এসেছিল। তা আসুক। মেয়েরা জটলা পাকিয়েছিল। তা পাকাক। কাউকে রাজরাণী, কাউকে রাজেশ্বরী, কাউকে ডাক্তার হওয়ার আশা দিয়ে গিয়েছে—তা দিক, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি রাগে টং হলুম যখন শুনলুম, পাশের বাড়ির আট বছরের মেয়ে মাধুরীলতা, আমার বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড, সেও নাকি এসেছিল এবং গণৎকার বলেছে, তার কপালে বাল-বৈধব্য আছে।

বাল-বৈধব্য তার কপালে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—আমি জানব কি করে, আর গণৎকারই বা জানবে কি করে? আর যদিও ধরেও নিই গণৎকার জানতোই, তবে সে বরাহমিহির সেটা বলতে গেল কেন মেয়েটাকে —ঐ আট বছরের ফুলের মত মেয়েটিকে?

এই দৈববাণীর ফল আরম্ভ হল পরের দিন থেকেই।

মাধুরী শুরু করল দুনিয়ার কুল্লে ব্রত-উপবাস, পূজা-পারণা। ইতু, ঘেঁচু

---

৪ আল্‌ফঁস্ দোদের শব্দে শব্দে অনুবাদ

হেন দেবতা নেই যে সে খুঁজে খুঁজে বের করে বাড়িতে তার পুজো লাগায় নি। তার বাড়িতে ছিলেন আমাদের দেশে সব চাইতে নামকরা নিষ্ঠাবতী ঠাকুরমা—তিনি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, মাধুরীর পুজোপাটের ঠেলায়।

এসবের অর্থ অতি সরল। অতিশয় প্রাঞ্জল। মাধুরী ত্রিলোকবাসী সর্বদেব, সর্বমানব, এমন কি সর্ব ভূতপ্রেতকেও প্রসন্ন রাখতে চায়, যাতে করে তাঁরা তাকে বাল-বৈধব্যের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখেন।

কিন্তু মাধুরীর মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়েছিল—আমার রাগ সেইখানটাতে। তার সর্বচৈতন্যে, সর্ব অস্তিত্বে মাত্র একটি চিন্তা; তাকে আমৃত্যু বাল্য-বৈধব্য বয়ে বেড়াতে হবে। এবং সে নাকি হবে শতায়ু! তার বাপ ঠাকুর্দা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে তখন শুধু তার ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকাতো, কোন কথা বলত না; স্পষ্ট বোঝা যেত আর সান্ত্বনাবাণী, স্তোকবাক্য, তত্ত্বকথা তার মনের উপর কোন দাগ কাটছে না।

মাধুরী তেমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী ছিল না। তবে হ্যাঁ, তার চোখ দুটির মত চোখ আমি আর কোথাও দেখি নি। সেই চোখ দুটিতে তার আট বছর বয়সে যে মধুর হাসি আমি দেখতে পেয়েছিলুম সেটি আর কখনো দেখি নি। তার রঙ ছিল শ্যাম। কিন্তু মাধুর্যে ভরা। তাই সব সময়ই মনে হত, এ মেয়ের নাম মাধুরী সার্থক। সে সুন্দর নয়, মধুর। মধু তো আর গোলাপ ফুলের মত দেখতে সুন্দর হয় না।

ষোল বছর বয়সে মাধুরীর বিয়ে হল। কুলীন ঘরের মেয়ে। সে-দিক দিয়ে অন্ততঃ সবাই লুফে নেবে। ছেলেটি বিলেত-ফের্তা ইঞ্জিনীয়ার। মাদ্রাজে কর্ম করে। মাধুরীকে দেখে ওদের বাড়ির সকলেরই পছন্দ হয়েছে। আমি তখন বিদেশে।

আমার বোন মাধুরীকে বড্ড ভালবাসতো। তাই আমাকে লেখা তার চিঠি ভর্তি থাকত মাধুরীর কথায়। পুজোপাট তার নাকি বিয়ের পর আরো অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাজে গিয়ে পেয়েছে আরেক নূতন সেট দেবদেবী। ওঁয়ারা তো ছিলেনই, এঁয়ারাও এসে জুটলেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, শুক্রবারে শুক্রবারে মসজিদে শির্ণী পাঠাতেও মাধুরীর কামাই যেত না।

বোন লিখেছিল, মাধুরীর স্বামীটি নাকি পয়লা নম্বরের বৈজ্ঞানিক, দেবদ্বিজে আদৌ ভক্তি নেই। মাধুরীর পালপার্বণের ঘটা দেখে সে নাকি রঙ্গ-রস করত, সেই পালপার্বণের আদিখ্যেতার—তার ভাষায়—কারণ শুনে নাকি হাসাহাসি করেছিল তার চেয়েও বেশী। তবে ছেলেটি খানদানী ঘরের ভদ্রছেলে ছিল বলে

এসব কথা তুলে মাধুরীর মনে কষ্ট দিতে চাইত না।

কিন্তু মোদ্দা কথা—বোন লিখেছিল—মাধুরী সুখী, মাধুরী স্বামী-সোহাগিনী।

যাক্। চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলুম।

তার ছ' মাস পরে বজ্রাঘাত।

মাদ্রাজে যুদ্ধের সময়, এক্‌স্‌প্লোশন না বোমাপাতের ফলে মাধুরীর স্বামী আপিসের চেয়ারের উপরই প্রাণত্যাগ করে।

সেদিন আপিস যাবার সময় সে নাকি মাধুরীকে বলে গিয়েছিল, 'তোমরা বাঙালীরা বড্ড ঢিলে। সময়ের কোন জ্ঞান নেই। আমি বাড়ি ফিরবো সাড়ে পাঁচটায়। তোমাকে যেন তৈরী পাই। দশ মিনিটের ভিতরে যেন বেরতে পারি। সিনেমা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

মাধুরী পাঁচটা থেকে তৈরী হয়ে বসে ছিল। কে জানে, কোন্ শাড়ীখানা পরেছিল? সেই হলদে রঙেরটা? যেটা আমি তাকে প্রেজেন্ট করেছিলুম—ওর রঙের সঙ্গে সুন্দর মানাতো বলে? থাক্ ওসব। মোহনীয়া গল্প শোনাতে আমি আসি নি। সমস্ত ব্যাপারটাই এমনি ট্রাজিক যে তার উপর অলঙ্কার চাপাতে ইচ্ছে করে না।

ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো—করে করে রাত এগারোটা হল। মাধুরী তার স্বামীকে এই প্রথম অন্‌পন্‌ক্‌চুয়েল হতে দেখল—এবং এই শেষ।

আর পাঁচজন বাঙালীই প্রথম দুর্ঘটনার খবর পান। তাঁরা রাত এগারোটায় এসে মাধুরীকে খবরটা দেন। সঙ্গে এসেছিলেন মাধুরীর এক বান্ধবী—ধর্মে তাঁর বিশ্বাস অবিচল ছিল বলে মাধুরীর সঙ্গে সখ্য হয়। তিনি খবরটা ভাঙেন। কি ভাষায়, সোজাসুজি না আশকথা-পাশকথা পাড়ার পর, জানি নে। তবে শুনেছি, মাধুরী একসঙ্গে এতজন লোককে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে আসতে দেখেই কেঁদে উঠেছিল।

মাধুরী কলকাতায় ফিরে এল।

এখানেই শেষ? গণৎকারের কথাই ফলল? তাও নয়।

মাদ্রাজ ছাড়ার পূর্বে মাধুরী তার সখীকে তার কোষাকোষী আর সব পুজোপাটার জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে। মাধুরী বলে নি—কিন্তু সখী বললেন, 'ও বলতে চেয়েছিল, এত করেও যখন দেবতাদের মন পেলুম না, তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমার আর কি হবে? আমার তো অন্য আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

কলকাতায় ফিরে মাধুরী চাকরি নেয়। বস্তিতে করপরেশনের ইস্কুলে। সেখানে তার বসন্ত হয়। তার বোনঝি—ডাক্তার—বললে, 'ওয়ান বিগ্ ব্লার্ব—করবার কিছু নাই।'

সে শতায়ু হয়ে বাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা উপভোগ করে নি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সে গত হয়। পরোপকারে প্রাণ দেয়। সে জিন্নৎবাসিনী, অমর্ত্যলোকে অনন্ত স্বামী-সোহাগিনী।

একটি অনমিত নাম : বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

'স্বর্গীয়' লিখতে গিয়েই কলম থেমে গেল; এমন কি ক্ষণজন্মা, পুরুষসিংহ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় 'পরলোক' গমন করেছেন,—এটা লিখতেও বাধো-বাধো ঠেকছে, কারণ বনবিহারী স্বর্গ, পরলোক, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।

বনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ চাকরিজীবনে তাঁকে বাধ্য হয়ে আজ পাকশী, কাল মৈমনসিং, পরশু বগুড়া করতে হয়েছে—এবং অসময়ে বেকসুর বদলি হলেও তিনি হয়তো প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো মেহেরবাণী চাইতেন না। বনবিহারী এ জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো 'ফেবার' চান নি, এবং ভগবানের কাছ থেকে অতি অবশ্য, নিশ্চয়ই না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় যান জানি নে, কিন্তু তার পরই চলে যান দেরাদুনে। সেখানে বেশ কয়েক বৎসর একটানা হোটেলে বাস করার পর হঠাৎ চলে যান—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আন্দামান। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে। বলা বাহুল্য, সেখানে রোমান্সের সন্ধানে যান নি। কাব্যে, সাহিত্যে তিনি কতখানি রোমান্টিসিজম বরদাস্ত করতেন বলা কঠিন, কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি রোমান্টিসিজমের পিছনে দেখতে পেতেন, make belief, সত্য থেকে আত্মগোপন, এস্কেপিজম এবং ভণ্ডামি এবং এর সব কটাকেই তিনি অত্যন্ত ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে তিরস্কার জানাতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আবার ভারতে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিত। তাই তাঁকে অনুরোধ জানালুম, তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম হক মধ্যম হক, আমি মোগলাই, বিলিতি কিছু কিছু রাঁধতে পারি; সে সময়ে আমার বাসস্থানটি ছিল প্রশস্ত ও নির্জনে—শ্মশানের কাছে অবস্থিত। আমার নিজস্ব বই তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পরিচিত একটি লাইব্রেরি কাছেই ছিল। অবশ্য সর্বপ্রধান প্রলোভন ছিলেন

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখুয্যে। তাঁর বাসাও নিকটে। এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মানুষ করেন এবং সে যেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নি। বিনোদবিহারীর ডাক নাম 'নন্তু'। বনবিহারী তাঁকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। আমার বাড়িতে এসে বাস করলে তিনি যে তাঁর নাস্তেকে অক্লেশে দু'বেলা দেখতে পাবেন সেইটেতে বিশেষ জোর দিয়ে আমি আমার চিঠিতে নিবেদন জানিয়েছিলুম। বিনোদবিহারী প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাঁর চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন ; তাই তাঁর পক্ষে অগ্রজ সন্নিধানে যাওয়া কঠিন ছিল।

আমি ক্ষীণ আশা নিয়েই আমন্ত্রণ-জানিয়েছিলুম, কারণ আমি তাঁর কৃতবিদ্য, বিত্তশালী, পিতৃভক্ত পুত্রকে উত্তমরূপেই চিনি। তাঁর শত কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুত্রের গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজী হন নি। আমার আশা ছিল, আমি তাঁর কেউ নই, তিনি জানতেন যে আমি ধর্মে, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একটা আস্ত জড়ভরত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিচল ভক্তি করি, এবং দাসের মত সেবা করবো ; বিশ্বসংসার নিয়ে তাঁর যত রকমের সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমি সহাস্য বদনে শুনেছি এবং শুনবো এবং তর্কযুদ্ধ করার মত লোকের অভাব হলে আমাকে দিয়েও কিছুটা কাজ চলবে—তিনি জানতেন, আমার জীবন কেটেছে 'তুলনাত্মক ধর্ম' চর্চায়।

তিনি এলেন না সত্য, কিন্তু আমাকে একটি অতিশয় প্রীতিপূর্ণ (তিনি সেন্টিমেন্টের আতিশয্য এতই অপছন্দ করতেন যে, সেফ্‌সাইডে থাকার জন্য সেটা বাক্যে, পত্রে সর্বত্র বর্জন করতেন) পত্র লিখে জানালেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ মনে রইল, সময় হলেই আসবো।'

আমার ক্ষোভ-শোকের অন্ত নেই যে তাঁর সময় আর হল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, আমি কে যে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতেন।

শেষদিন পর্যন্ত, এত সব ঘোরাঘুরির মাঝখানেও সর্বত্র তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী। বনবিহারীর অধিকাংশ লেখাই ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছত না। প্রকাশিত হলে ফাইলে রাখতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলতেন না, 'অমুক কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে, পড়ে দেখো।' তাঁর পরিপক্ক যৌবনে কিন্তু তিনি আমাদের মত বালকদের প্রতি সদয় ছিলেন। সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ বহু লেখা তিনি সোৎসাহে আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন।

এখনো যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী প্রামাণিক নিবন্ধ লিখতে পারবেন। কোন্ লেখা কোন্ উপলক্ষে লেখা হয়েছিল, কোন্ ব্যঙ্গচিত্র আঁকবার সময় কাকে তিনি মনে মনে সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজের কোন্ গুপ্ত পাপাচার তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, এর বেশীর ভাগই একমাত্র তাঁরই জানার কথা। এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক ঐ বিষয়ে কখনো কিছু লেখেন নি এটা কেমন জানি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। আমি নিজে জানি, ছাত্রদের দুই ধরনের ব্যাণ্ডেজ শিখিয়ে তাদের নাম বলে, দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে যাচাই করার পর একটা তৃতীয় ব্যাণ্ডেজ হয়তো শেখালেন। কোনো বুদ্ধিমান ছেলে হয়তো লক্ষ্য করলো এটার নাম তিনি বলেন নি ; শুধোলে পর বলতেন, 'ওঃ দ্যাট্ ওয়ান ? ওটা ব্যাণ্ডেজ আ লা বনবিহারী' (তিনি নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী শিখেছিলেন ও উচ্চারণটিও তাঁর চমৎকার ছিল। আমি ফরাসী শিখতে আরম্ভ করেছি জেনে তিনি আমাকে মপাসাঁ পড়ে শুনিয়েছিলেন ; নতুবা নিতান্ত বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত বনবিহারী আপন বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্বকৃতিত্বই লুকিয়ে রাখতেন)।

বনবিহারী সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রায় অসম্ভব শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র যোগাড় করা। বেনামে ছদ্মনামে তো লিখেছেনই, তদুপরি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন প্রকারের মোহ ছিল না বলে সেগুলোকে তাদের ন্যায্য সম্মান দেবার জন্য তিনি কোনো চেষ্টা তো করতেনই না, উল্টে নিতান্ত অজানা অচেনা কাগজে প্রায়ই বাছাই বাছাই লেখা ছাপিয়ে দিতেন। এবং আমার জানতে সত্যই ইচ্ছে করে, তিনি তাঁর লেখার জন্যে কখনো কোনো দক্ষিণা পেয়েছেন কিনা।

উপস্থিত আমি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ নিবেদন করছি ; যদি কোনো দিন তাঁর প্রকাশিত রচনা ও ছবির দশমাংশের এক অংশও যোগাড় করতে পারি তবে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধেও কিছু পেশ করার ভরসা রাখি। অথবা হয়তো তখন দেখব, তাঁর জীবন-দর্শন ছিল যে, মানুষের পক্ষে কোনো প্রকারের শাশ্বত জীবনদর্শনে পৌঁছনো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ শাশ্বত বলে কোনো বস্তু, ধারণা বা আদর্শ এ-সংসারে আদপেই নেই।

'ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিজ—অল ইজ ভ্যানিটি' বাইবেলের এই আপ্তবাক্য তাঁর মুখ দিয়ে বলাতে আমার বাধছে, কারণ নাটকীয় ভঙ্গিতে কোনো জিনিসই প্রকাশ করাতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। কারণ এসব ভঙ্গি, স্টাইল, পোজ থেকে উদ্ভূত হয় ধর্মগুরুর দঙ্গল—এবং বনবিহারীর সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁদের সম্বন্ধে

আমরা যত কম শুনতে পাই ততই ভালো। বলার মত বিশেষ কিছু তো নেই—হয়তো বলতেন বনবিহারী—তাহলে বলতে গিয়ে অত ধানাইপানাই কেন?

বৃষের মত স্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু—এসব শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে বনবিহারী নিশ্চয়ই সুপুরুষের পর্যায়ে পড়তেন না; তৎসত্ত্বেও বলি, বনবিহারীর মত অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বান্ সুপুরুষ আমি দেশ-বিদেশে অতি অল্পই দেখেছি। বাঙালী ফর্সা রঙ পছন্দ করে, কিন্তু বনবিহারীর গৌরবর্ণ আমি অন্য কোনো বাঙালীর চর্মে দেখি নি। বলা বাহুল্য যে সে বর্ণ ইংরেজের ধবলকুষ্ঠ শ্বেত নয়। গৌর হয়েও সে বর্ণে ছিল কৃষ্ণের স্নিগ্ধতা। তপ্তকাঞ্চন তো সে নয়ই, 'চাঁদের অমিয়াসনে চন্দন বাটিয়া'ও সে বর্ণ মাজা হয় নি। নদীয়ার গোসাঁইকে আমি দেখি নি, কিন্তু তাঁকে কল্পনায় দেখতে গেলে তাঁর অঙ্গে আমি বনবিহারীর বর্ণ চাপাই। তাঁর চুল ছিল কটা। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলুম, 'ঋগ্বেদে না কোথায় যেন অগ্নির দাড়িকে রক্তবর্ণ বলা হয়েছে; আপনি দাড়ি রাখলে সেটা ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করবে।' আমার সত্যই মনে হ'ত, কেমন যেন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কি যেন এক এ্যাটাভিজমের ফলে তিন হাজার বৎসর পর আর্য ঋষি গৌড়দ্বিজের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বনবিহারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তর্কজাল বিস্তার করে পর্যায়ক্রমে, অপ্রমত্ত চিত্তে যে-সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তার অর্থ: যারা বলে বাঙালীর গায়ে কিঞ্চিৎ আর্যরক্ত আছে এটা তাদের ভ্রম—যারা বলে বাঙালী পরিপূর্ণ আর্য—তাদের ভ্রমের চেয়েও মারাত্মক দুষ্টবুদ্ধিজাত ভ্রম।

ঐ সময়ে আমি রেনাঁর খৃষ্ট-জীবনী পড়ি অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসের কাছে।[১] প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখেছেন 'যে লোক মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘোচাবার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা দিয়েছেন (অর্থাৎ খৃষ্ট) তাঁর ধমনীতে কোন্ জাতের রক্ত প্রবাহিত সে অনুসন্ধান করতে যাওয়া অনুচিত।' বনবিহারী সমস্ত জীবন ধরে বিস্তর অক্লান্ত জিহাদ লড়েছেন, কিন্তু বর্ণ বৈষম্য চোখে পড়লেই তিনি নিষ্কাশিত করতেন তাঁর শাণিততম তরবারি। এস্থলে বলে রাখা ভালো, বনবিহারী তাঁর জিহাদ চালাতেন হৃদয়হীন যুযুধানের মত। তাই সত্যের অপলাপ না করে অনায়াসে বলতে পারি, তাঁর মত মিলিটেন্ট নাস্তিক এ-দেশে তো কখনই জন্মায় নি, বিদেশেও নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয়। 'পীসফুল কো-এগ্‌জিজস্টেনস্'

---

১ ইনি পার্সী দস্তুর (যাজক) সম্প্রদায়ের লোক; শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' পৃ. ১২৫।

নীতিটি তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে বাইরে সর্বত্রই, এবং টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটির সার্জন। তাঁর বক্তব্য, 'তোমার পায়ে হয়েছে গ্যাঙ্‌রীন, সেটা আমি কেটে ফেলে দেব। গ্যাঙ্‌রীনের সঙ্গে আবার পীসফুল কো-এগ্‌জিস্টেনস্‌ কি?' কিন্তু পাঠক ভুলে ক্ষণতরেও ভাববেন না, বনবিহারী অসহিষ্ণু ছিলেন। এর চেয়ে বৃহত্তর, হীনতর মিথ্যা ভাষণ কিছুই হতে পারে না। 'তুমি আস্তিক। তোমার মস্তিষ্ক থেকে আমি সেই অংশ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলব। কিন্তু তোমার প্রতি আমি অসহিষ্ণু হব কেন? বস্তুত চিকিৎসক বলে আমার সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। তোমার পরিচিত কারো সিফিলিস হলে তুমি শুধু সিফিলিস না, সেই লোকটিকেও বর্জন করো। আমি সিফিলিস দূরীভূত করি, কিন্তু সে হতভাগ্যকে তো দূর দূর করে দূরীভূত করার চিন্তা আমার স্বপ্নেও ঠাঁই দিই না। প্লেগ এলে তুমি এ শহরের নাগরিকদের বিষবৎ বিবেচনা করে তাদের বর্জন করো; আমি তা করি নে।' এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে শপথ করতে রাজী আছি এটা তাঁর বাগাস্ফালন নয়। কাব্যে আমরা বাক্‌ ও অর্থের সমন্বয় অনুসন্ধান করি, জীবনে করি বাক্‌ ও কর্মের। এ দুটির সমন্বয় বনবিহারীতে প্রকৃতিগত ছিল। বলতে যাচ্ছিলুম 'বিধিদত্ত', কিন্তু তাঁর আত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে চাই নে। আবার ভুল করলুম, তিনি আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না, কাজেই হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতই তাঁর আত্মাকে নিপীড়িত করার সম্ভাবনা!

বনবিহারী তাঁর বাল্যবয়সের অধিকাংশটা কাটান তাঁর মাতামহের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি কিন্তু সেটা বের করা কঠিন হবে না। এই মাতামহটি ছিলেন গত শতাব্দীর ধনুর্ধর, অপরাজিত দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে ছিলেন সে যুগের চূড়ামণি, তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যালাপী সখা। যে দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে বঙ্কিমাদি মনীষিগণ আসতেন তত্ত্বালোচনার জন্য সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়েছেন দিনের পর দিন এই নৈয়ায়িকের অপরিসর পথের ক্ষুদ্রতর গৃহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই আপন-ভোলা সাদা দিলের মানুষ যে তর্কে বিরক্তির সঞ্চার হলে তাঁর কণ্ঠ তপ্ততর ও উচ্চতর হতে আরম্ভ করত—বনবিহারীর মাতামহ এ তত্ত্ব জানতেন বলে সেটা আদৌ গায়ে না মেখে পূর্বের চেয়ে ক্ষীণতর কণ্ঠে মোক্ষমতর যুক্তি পেশ করতেন। খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বেহুঁশ। শেষটায় বেলা প্রায় তিনটায় উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে বলতেন, 'ঝকমারি, ঝকমারি, এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করা; আমি চললুম এবং এই

আমার শেষ আসা।' বনবিহারীর মাতামহ ক্ষীণকণ্ঠে বলতেন, 'গিন্নী পুঁই-চচ্চড়ি রেঁধেছিল।' অট্টহাস্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ টেনে টেনে বলতেন, 'সেটা আগে বললেই হ'ত, আগে কইলেই হ'ত।' তারপর বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ তাঁর 'গার্জেন'কে বলতেন (মহর্ষিদেব এই আপন-ভোলা যুবরাজের জন্য একটি তদারকদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন), 'যাও, বাড়ি থেকে দাঁত নিয়ে এসোগে।' শুধু খাবার সময়ই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। আমার ভাবতে বড় কৌতুক বোধ হয় যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম দৌহিত্র বাড়ির কোর্মা-কালিয়া ছেড়ে অনাড়ম্বর নৈয়ায়িকের অপরিসর বারান্দায় পিঁড়িতে বসে পুঁই-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে উচ্চকণ্ঠে পাড়া সচকিত করে তার অকৃপণ প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।

পরদিন 'নাউ-চিঙড়ি'! 'নাউ'—লাউ না!

এ ধরনের একাধিক বিচিত্র বিষয় আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি প্রাগুক্ত বিনোদবিহারী মহাশয়ের কাছ থেকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজিতে মাত্র দু'জন দার্শনিক পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে সপ্রশংস চিত্তে উল্লেখ করেছেন যাঁরা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদের গুরুভার কর্তব্য আপন আপন স্কন্ধে অনায়াসে তুলে নিতে পারেন ; এঁদের একজন 'পুঁই-চচ্চড়ি'-রসিক দার্শনিক—বনবিহারীর মাতামহ। এবং তাঁর সম্বন্ধে বলি, সে যুগে পিরিলি ঠাকুররা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, বনবিহারী বাল্য বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থায়ও সূর্যোদয় থেকে প্রারম্ভ পূজা-অর্চনা শেষ করতে করতে কোনো কোনো দিন ক্লাসের সময় পেরিয়ে যেত। এটাতে আমার সামান্য বিস্ময় লাগে, কারণ আমি যে কয়টি প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িককে চিনি তাঁদের সকলেই পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে ঈষৎ উদাসীন ছিলেন। আমার আপন গুরু পথে যেতে যেতে বারোয়ারি সরস্বতী প্রতিমা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছিলেন, 'ন দেবায়, ন ধর্মায়।' অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে (অবশ্য তিনি স্মৃতি জানতেন অত্যল্পই এবং সেজন্য তাঁর কণামাত্র ক্ষোভও ছিল না) এ রকম পুজোর কোনো ব্যবস্থা নেই বৌদ্ধ ধর্মে ('ন ধর্মায়'-এর ধর্ম এস্থলে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' থেকে নেওয়া) তো থাকার কথাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সরস্বতীর যে 'কুখ্যাতি' (হয়তো অমূলক) আছে সেটা তাঁর স্মরণে আসতো। তা সে যাক। কারণ আমার ধর্মের সুফীদের ও খৃষ্টান মিস্টিকদের ভিতরও ক্রিয়াকর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ অনাসক্তি লুক্কায়িত রয়েছে।

অকস্মাৎ একদিন বনবিহারী নাস্তিকরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন ও শুধু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম (রিচুয়েল) নয়, শঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে হাঁচি টিক্‌টিকির বিরুদ্ধে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে মারমুখো জিহাদ ঘোষণা করলেন। খৃষ্টান মিশনারী পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, উদ্দীপনা এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখলে বিস্ময়ের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করতো। এই যে সামান্য আমি, আমার বয়েস তখন কত হবে? ষোলগোছ,—আমাকে পর্যন্ত প্রথম দর্শনের পাঁচ মিনিটের ভিতর, কলার অভাবে কুর্তার গলার মুরী ধরে শুধোলেন, 'তুমি ঈশ্বর মানো?'

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম, 'আজ্ঞে আমার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অবিশ্বাসও দৃঢ় নয়।' আমি তখন জানতুম না, এই উত্তরই চার দশক পরে কলকাতার মডার্ন মহিলাদের ভিতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস দৃঢ়ই হক, আর শিথিলই হক, সেইটে কিসের উপর স্থাপিত আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

কী যুক্তি দেব আমি? যেটাই পেশ করি, সেটাই বুমেরাঙের মত ফিরে আসে ফের আমারই গলায়। ইতিমধ্যে আমার জন্য উত্তম মমলেট, ঘোলের শরবৎ এসেছে—দুপুর অবধি তর্ক চালালে অবশ্যই পুঁই-চচ্চড়ি আসতো!

আমি রণেভঙ্গ দিতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। আমি যে ধর্মের 'অধর্ম' পথে চলেছি সেইটে তিনি সপ্রমাণ করতে চান, সর্বদৃষ্টিকোণ থেকে, সর্বদৃষ্টিবিন্দু থেকে। এবং আমার সব চেয়ে বিস্ময় বোধ হল যে, আমি যে ক'জন ইয়োরোপীয় নাস্তিক দার্শনিকের নাম জানতুম—অবশ্য অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে—তাঁদের কাছ থেকে বনবিহারী ঈশ্বরঘ্ন, ধর্মঘ্ন যুক্তি আহরণ করলেন না। বিস্তর তর্কজাল বিস্তৃত করার পর, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলো সাম্ আপ্ করতেন, এ-দেশী পরিভাষায় সূত্ররূপে প্রকাশ করতেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে! এই প্রথম আমার গোচরে এল যে, আর্যাবর্তের মত ধর্মাবর্তের দেশেও অসংখ্য নাস্তিক প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বহুযুগ পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিয়েছেন।

সেদিন আমি বড়ই উপকৃত হয়েছিলুম। ঈশ্বরবিশ্বাসে যে-সব বাতিল যুক্তি আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমি ঈশ্বর সন্ধানে সত্য যুক্তি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করলুম। কিন্তু আমার কথা থাক।

পাঠক, আপনি মোটেই ভাববেন না, বনবিহারীর প্রধান সংগ্রাম ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর সংগ্রাম ছিল জড়তা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার, সামাজিক অনাচার, তথাকথিত অপরাধীজনের প্রতি অসহিষ্ণুতা, যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ, চিন্তা না করে বাঁধা পথে চলার বদ অভ্যাস, মহরমের

তাজিয়ার সামনে কুমড়ো-গড়াগড়ি, যৌন সম্পর্কের উপর তথাকথিত শালীনতার পর্দা টেনে আড়ালে আড়ালে কুমারী ও বিধবার সর্বনাশ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের অকারণ দম্ভ, অব্রাহ্মণের অহেতুক দাস্যমনোবৃত্তি, তথাকথিত সত্যরক্ষার্থে সত্য গোপন, স্বার্থান্বেষণে বিদেশীর পদলেহন ও অন্ধানুকরণ কিন্তু যেখানে সে মহৎ সেটাকে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে বর্জন, বৎসরের পর বৎসর, প্রতি বৎসর রুগ্না অর্ধমৃতা স্ত্রীকে গর্ভদান করে তার কাতর রোদন অনুনয়-বিনয় পদদলিত করে তাকে অবশ্যম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর দিকে বিতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, ধর্মসভায় সচ্চরিত্র সজ্জন খ্যাতি অর্জন (বলা বাহুল্য চিকিৎসক হিসাবে ঠিক এই ট্র্যাজেডি তাঁর সামনে এসেছে বহু, বহুবার), গণিকালয় থেকে একাধিকবার বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি আহরণ করে নিরপরাধ অর্ধাঙ্গিনীর শিরায় শিরায় সেই বিষ সংক্রামণ, একবার একটি মাত্র ভুল করার জন্য অনুতপ্তা রমণীকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যভিচার করাতে বাধ্যকরণ—

হে ভগবান! এ যে অফুরন্ত ফর্দ! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বনবিহারীর সিকি পরিমাণ প্রকাশিত—অপ্রকাশিতের হিসেব নিচ্ছি নে এবং অধিকাংশ লেখাই যে তিনি ছিঁড়ে ফেলতেন সেও বাদ দিচ্ছি—গদ্য পদ্য ব্যঙ্গচিত্র সংগ্রহ করে কেউ যদি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য বিষয়গুলো সংকলন করেন তবে এ-স্থলে আমার প্রদত্ত নির্ঘণ্টের চেয়ে বহুগুণে বৃহত্তর ও কঠোরতর হবে।

কী নিদারুণ ব্যঙ্গ, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি অন্যায় আচরণ, ভণ্ড কাপুরুষতাকে আক্রমণ করতেন সে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই জানেন। ভাষার শাণিত তরবারি তাঁর হাতে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরণ করতো এবং এই মরমিয়া মোলায়েম আ মরি বাঙলা ভাষাও যে কতখানি বহ্নিগর্ভা সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হ'ত বনবিহারীর অদম্য, নিঃশঙ্ক আঘাতের পর আঘাত থেকে। প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেকটি বর্ণ বিশুদ্ধ যুক্তির উপর দণ্ডায়মান। শাস্ত্র ভাঙতে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তখন শাস্ত্রের দোহাইয়ের তো কথাই ওঠে না, তিনি বিজ্ঞানের দোহাইও দিতেন না। কোনো কিছুই অভ্রান্ত নয়, কোনো সত্যই শাশ্বত নয়; অতএব প্রত্যেকটি সমস্যা নূতন করে যাচাই করে দেখতে হবে, এবং এই সাধনা চলবে আমৃত্যু।

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে যে তিনি গোড়াতেই আক্রমণ করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি এই বিশ্বাস by itself, per se অন্যান্য সংস্কারের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। তাঁর ধারণা জন্মেছিল—এবং সেটা বিস্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর, যে—এই বাংলা দেশে যত প্রকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক

অন্যায় অবিচার হচ্ছে, যা কিছু নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে,—আর ধর্মের নামে অনাচার শোষণের তো কথাই নেই—এ সব-কিছু হচ্ছে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে।[২]

যে-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বনবিহারী লড়াই দিতেন তাদের বিরুদ্ধে কি অন্য বাঙালী লড়ে নি? নিশ্চয়ই লড়েছে। বর্ণবৈষম্য, আহারে-বিহারে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নির্মাণ, ধর্মের নামে অধর্মচর্চা—শাস্ত্রাধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা, ধর্মত্যাগীকে পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া ইত্যাকার বহু বহু সংস্কার আচার দূর করার জন্য চৈতন্য সংগ্রাম দেন ও সর্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা এবং আরো অনেকে মূঢ়তা, কুসংস্কার ও একাধিক পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এঁদের তুলনায় বনবিহারীকে চেনে কে?

কারণ বনবিহারী অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

প্রাগুক্ত সকলেই দেশ-দশকে পাপচিন্তা-পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের অর্থাৎ ধর্মের শরণ নিয়েছেন। বনবিহারী মানবিকতার শরণ নেন। প্রচলিত ধর্মও তাঁর শত্রু। একমাত্র ধর্মের moral, ethical যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধোপে টেকে সেইটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠিতে যা লেখেন তার নির্যাস ছিল এই, শাস্ত্র মেনে হিন্দু তার সামাজিক জীবন যাপন করে না। সে মানে লোকাচার, দেশাচার। বিদ্যাসাগর যদি সর্বশাস্ত্র দিয়েও দ্ব্যর্থহীন নিরঙ্কুশ সপ্রমাণ করেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ তবু হিন্দু সে-মীমাংসা গ্রাহ্য না করে আপন লোকাচার দেশাচার আগেরই মত মেনে নিয়ে বিধবার বিয়ে দেবে না। অতএব বিদ্যাসাগরের উচিত যুক্তি ন্যায় ও মানবিকতার (এই ধরনেরই কিছু, আমার সঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা—reasonএর উপর নির্ভর করা, শাস্ত্রের উপর না করে) উপর নির্ভর করা।

২ তাই তাঁর নিজস্ব মৌলিক ফরমূলা বা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ছিল:—
ভগবান আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। (এই স্বতঃসিদ্ধটি আস্তিকরা স্বীকার করেন ও বনবিহারী এটা উপস্থিত তর্কস্থলে মেনে নিচ্ছেন)
সেই বুদ্ধি বলছে, "ভগবান নেই"।
∴ ভগবান বলছেন, "ভগবান নেই"।

Q. E. D.

বিদ্যাসাগর উত্তরে কি লিখেছিলেন, আদৌ উত্তর দিয়েছিলেন কি না সেটা বহু অনুসন্ধান করেও আমি খুঁজে পাই নি।[৩] কিন্তু তিনি যে বঙ্কিমের উপদেশ গ্রহণ করেন নি, সে কথা কারো অবিদিত নেই। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, শাস্ত্রের সাহায্যে হয়তো বা কিছু কার্যোদ্ধার হবে, যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছুই হবে না। বিদ্যাসাগর আপন দেশবাসীকে বিলক্ষণ চিনতেন।

অতএব প্রাগুক্ত রামমোহনাদি সকলেই লুথার জাতীয় সমাজ ও ধর্মসংস্কারক। যে বাইবেল পোপ মানেন, খৃষ্টান মাত্রই মানে—সেই বাইবেল দিয়েই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই বিধিদত্ত অধিকার আছে—আপন বুদ্ধি অনুযায়ী বাইবেল থেকে বাণী গ্রহণ করে আপন জীবন চালনা করার; 'চিরন্তন, অভ্রান্ত' কোনো পোপকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তলস্তয়, গাঁধী এই সম্প্রদায়ের।

ভলতেয়ার এ পথ স্বীকার করেন নি। তিনি নির্ভর করেছিলেন যুক্তি (রীজন), শুভবুদ্ধি (মোটামুটি কমন সেন্‌স্), মানবতা ও ইতিহাসের শিক্ষার উপর। তাঁর কমনসেন্‌স্ ও ইতিহাসের উপর বরাত মানার একটা উদাহরণ দি। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা ধর্মান্ধ হয়ে যে প্রথম খৃষ্টান মিশনারী সিন টমাসকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল বা পশ্চাদ্ধাবিত হলে পর তিনি গুহাগহ্বরে বিলীন হয়ে যান, সেই কিংবদন্তী অস্বীকার করে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভলতেয়ার বলছেন, যে হিন্দুর পরধর্মে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমরা বহুকাল ধরে বহু পর্যটকের কাছ থেকে শুনে আসছি, সেইটে হঠাৎ অবিশ্বাস করতে কাণ্ডজ্ঞানে (কমন সেন্‌সে) বাধে। এ দেশের বনবিহারী ভলতেয়ার—কিন্তু তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য নন।

তবে জনসাধারণ বনবিহারীকে চেনে না কেন? তার সর্বপ্রধান কারণ, বনবিহারী নিজেকে কখনো সংস্কারক, যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে দেখেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন, উচ্চাসনে দণ্ডায়মান হয়ে অনলবর্ষী ভাষণের সাহায্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে, কিংবা ভাবালুতার বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় পরিবর্তন আনা যায় না। কিংবা হয়তো স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক বিনয়বশতঃ (সামান্য পরিচয়ের ন'সিকে লোক ভাবতো, তাঁর মত দম্ভী গর্বী ত্রিসংসারে বিরল—বিশেষতঃ লোকটা যখন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর যুগযুগাধিকৃত স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে সরাতে চায়!) তিনি পেডেস্টেলে আরোহণ করতে

৩ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

চাইতেন না, কিংবা হয়তো তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। তা সে যা-হোক, আমরা যে তাঁর মত কিংবা তাঁর চেয়েও শক্তিশালী লোকের জন্য এখনো প্রস্তুত হই নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন ?

বনবিহারী তো এমন কিছু নূতন কথা বলেন নি যা ভারতে কেউ কখনো বলে নি। স্থির হয়ে একটু ভাবলেই ধরা পড়বে ভারতবর্ষের চিন্তা-জগৎ (ধর্ম-শাস্ত্র-নীতি-আচার-ঐতিহ্য-কলা-জ্ঞানবিজ্ঞান) কি দিয়ে গড়া।

১। সনাতন হিন্দুধর্ম ২। বৌদ্ধধর্ম ৩। জৈনধর্ম ৪। দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য ৫। চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত মতবাদ।

প্রথমটি বাদ দিলে বাকি চারটি চিন্তাধারাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার বার সাবধান-বাণী প্রচারিত হয়েছে, তোমার সুখ-শান্তি, তোমার পরমাগতি সম্পূর্ণ তোমারই হাতে ; দৃশ্য এবং অদৃশ্য কোনো লোকেই এমন কোনো অলৌকিক শক্তি নেই যে তোমাকে কোনো প্রকারে কণামাত্র সাহায্য করতে পারে। এই চিন্তাধারা আদৌ অর্বাচীন নয়। বৈদিক যুগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যখন যাগযজ্ঞহোমপশুবলি সর্বত্র স্বীকৃত, ঋষিকবিগণ যখন তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিস্ময়ে অপৌরুষেয় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি আরেকটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ, আরেক সত্যান্বেষী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন—ধন্য হোক সে প্রশ্ন, ধন্য হোক তার জন্ম-লগ্ন—'তাহলে কোন্ দেবতাকে আমি স্বীকার করবো ?' এই প্রশ্ন থেকেই আরম্ভ হল, চরম সত্যের—আলটিমেট রিয়েলিটির—অনুসন্ধান। এই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী আরণ্যক-উপনিষদের যুগে—বেদান্তের মূল সূত্র সব-কিছুই ব্রহ্ম, এই তিন ভুবন আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর জন্ম নেয় ঐ সময়েই, হয়তো তার পূর্বেই, এবং সবল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় লোকায়ত মতবাদে এবং তারও পরে তীর্থঙ্করদের কণ্ঠে, বুদ্ধদেবের কণ্ঠে—দেবদেবীতে পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করে মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্ররূপে স্বীকার করা। এরই চরম বিকৃতরূপ—চার্বাকের মতবাদ, যে মতবাদ নৈতিক দায়িত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

বৌদ্ধধর্ম এ-দেশ থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সে মতবাদ সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তর্কযুদ্ধে পরাজিত কোনো এক সাংখ্যতীর্থ বোধ হয় বৌদ্ধবৈরী শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেছিলেন, বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে যে এতখানি সন্ধি করেছে যে, সে মতবাদ আত্মসাৎ করতে তার বাধে নি, তাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলবো, না তবে কি বলবো ?

আর নিরীশ্বর জৈনরা তো, এখনো ভারতবর্ষে বাস করেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যের চর্চা করেন এখনো বহু পণ্ডিত: যাঁদের মতে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

নৈয়ায়িকরা কোন্ পন্থায়?

এবং এদেশের সহজিয়ারা সৃষ্টিকেন্দ্র করেছেন মানুষকে: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

পূর্বেই বলেছি, বনবিহারী ভলতেয়ারের শিষ্য নন। তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য এ-কথা তাঁর সামনে বললে তিনি নিশ্চয়ই তেড়ে আসতেন। অবশ্যই বলতেন, ভলতেয়ার যদি দেখেন যে তাঁর মতবাদ আমার মতবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তবে তিনি গর্ব অনুভব করতে পারেন; আমার তাতে কি? আবার তাঁকে যদি বলা হ'ত, তিনি ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য দর্শন প্রচার করছেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আরো মারমুখো হতেন। নিশ্চয়ই বলতেন, 'চুলোয় যাক্ ("জাহান্নমে[৪] যাক", নিশ্চয়ই বলতেন না, কারণ যে জায়গা নেই, সেখানে কোনো মতবাদকে পাঠিয়ে বনবিহারী অবশ্যই সন্তুষ্ট হতেন না!) তোমার সাংখ্য জৈন মতবাদ; পিছন পানে তাকাও কেন? নিজের বুদ্ধি, নিজের যুক্তি, নিজের রেশনালিটির উপর নির্ভর করতে পারো না? কপিল-জীনের ঠ্যাকনা ছাড়া বুঝি দাঁড়ানো যায় না? তুমি আছ, আমি আছি—ব্যস্। আমরা বের করে নেব ন্যায় আচরণ কি? আর রাগ কোরো না, আমি আমারটা বহুপূর্বেই একাই বের করে নিয়েছি।'

ডন্ কুইকসটের সঙ্গে বনবিহারীর মাত্র একটা বিষয়ে পার্থক্য। বিস্তর মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাহিনী পড়ে পড়ে ডনের মাথা গরম হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন তিনি সে যুগের শিভালরাস্ নাইটদের একজন।[৫] ব্যস্, আর যাবে

---

৪ জাহান্নম এসেছে হীব্রু গেহানেস থেকে;

বলা উচিত দুটো শব্দই কগ্নেট। এই গেহানেস প্যালেস্টাইনের ভ্যালি অব্ ডেথ্—ভৌগোলিক উপত্যকা।

৫ এ যুগের ভাইসচ্যান্সেলর হাস্সান সুহ্রাওয়ার্দী যখন লাটসাহেবকে বীণা-কল্যাণীর হাত থেকে বাঁচান তখন তাঁকে রাতারাতি (অর্থাৎ এক night নাইটে-ই) নাইট (knight) করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (?) শহীদ সুহ্রাওয়ার্দী একটি অতুলনীয় কবিতায় বলেন, 'মধ্যযুগে ড্র্যাগনের (রাক্ষস) হাত থেকে কুমারী উদ্ধার করে বীরপুরুষ নাইট হতেন. এ যুগে কুমারীর হাত থেকে ড্র্যাগনকে রক্ষা করে মানুষ নাইট হয়।'

কোথায়। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে একাকী, সম্পূর্ণ একা তিনি খোলা তলওয়ার হাতে আক্রমণ করলেন জলযন্ত্রকে (উইণ্ড মিলকে)।

তারও বহু পরে যিনি এ-যুগের সর্বশেষ নাইট বলে নিজেকে প্রচার করেন তিনি ফীল্ড মার্শাল হেরমান্ গ্যেরিঙ—ন্যুর্নবের্গ মোকদ্দমায়। তাঁর কৃতিত্ব: জর্মনিতে তিনিই সর্বপ্রথম কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্প স্থাপনা করেন (অবশ্য তার বহু পূর্বে ইংরেজ করেছিল বোয়ার-যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায়) এবং আইষমানের ইহুদি-হননে তাঁর সম্মতি ছিল। নিহত ইহুদিদের ভিতর লক্ষাধিক কুমারী কন্যাও ছিল।

বনবিহারী কপিল-জীন-চার্বাক পড়ে পড়ে ডনের মত মাথা গরম করেন নি। ধীরস্থির মনে চিন্তা করে, মীমাংসায় পৌঁছে তিনি আক্রমণ করলেন বঙ্গদেশের জগদ্দল জাড্যকে। এখনো তাঁর মাথা কতখানি ঠাণ্ডা সেটা বোঝা যায় এর থেকে যে, তখনো তাঁর ঠোঁটে হাস্য-ব্যঙ্গ-রস—তাঁর নব-প্রকাশিত নাস্তিক্য প্রচারকামী পত্রিকা 'বেপরোয়া'র (বাঙলা দেশে এ ধরনের কাগজ বোধ হয় এই প্রথম আর এই শেষ) প্রথম সংখ্যায় প্রথম 'war song'-এ তিনি বললেন,

'টলবো না কো অনুস্বার আর বিসর্গের
ঐ ছর্‌রাতে
কিংবা দেখে টিকির খাড়া সঙ্গীন !'

সে পত্রিকায় কি না থাকতো ? ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য, চিত্র—এন্তেক পদিপিসির মাদুলি, হাঁচি-টিকটিকি। এর পূর্বে তিনি 'ভারতবর্ষে' ব্যঙ্গচিত্রসহ বঙ্গজীবনবৈচিত্র্য তাবলো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন: তার একটি ছিল কেরানী—লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণবেশ রুক্ষ-কেশ কেরানীর ছবির নিচে ছিল,

'চাকরি গেল, চাকরি গেল, চাকরি রাখা
বিষম দায়
ঐ গো, বুঝি ন'টা বাজে, ঐ গো বুঝি
চাকরি যায় !
বিজলি-বাতির ফানুস হেন ঠুন্‌কো
মোদের চাকরি ভাই !
ফট করে সে ফাটে, কিন্তু ফাটার শব্দে
চমকে যাই।'

সর্বশেষে কেরানী যেন বৈদ্যগুরু, কবিরাজ, ডাক্তার, মহামান্য শ্রীযুত

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কেই ব্যঙ্গ করে বলছে (উইথ এ টুইস্টেড আইরিশ স্মাইল)—

'ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর ?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো সে তারপর।'

রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে আমি ঈষৎ পরিচিত। রবীন্দ্ররসিকদের রচনা আমি পড়েছি। অধুনা 'রবীন্দ্রায়ণ'ও (অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংকলন, তদুপরি অতুলনীয় সম্পাদন) অধ্যয়ন করেছি। তারপরও বলবো, মুক্তকণ্ঠে বলবো, বনবিহারীর মত রবীন্দ্রসৃষ্টির চৌকশ সমঝদার আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। তাই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে বনবিহারীর সমালোচনাই সর্বোৎকৃষ্ট। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অন্য সমালোচকদের প্রতি তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলতেন, 'রসসৃষ্টির পথে যত সব অবান্তর বস্তু নিয়ে বর্বরস্য শক্তিক্ষয়! রবীন্দ্রনাথ নাকি নগ্ন যৌনের অশ্লীল ছবি আঁকেন—তা তিনি আঁকেন নি। আর যদি আঁকেনই বা, তাতেই বা কি ? এ সব তো সম্পূর্ণ অবান্তর—রসসৃষ্টি হলেই হল! রবীন্দ্রনাথের রূপক নাকি অস্পষ্ট! তা হলে চশমা নাও—ওঁকে দোষ দিচ্ছো কেন ?'

তার পর বুঝিয়ে বলতেন, 'দে আর অল বার্কিং আপ দি রং ট্রী'—অর্থাৎ বেরালটা উঠেছে একটা গাছে, আর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে অন্য গাছের গোড়ায়।

সত্যেন দত্তকে আজকের দিনে লোক আর স্মরণে আনেন না ; অথচ তিনি যখন সবে আসরে নেমেছেন, সেই সময় থেকেই বনবিহারী তাঁর প্রশংসা গেয়েছেন। সেই সত্যেন দত্তই যখন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে মাঝে মাঝে অনুপ্রাস ও ছন্দের ম্যাজিকের (জাগ্‌লারি) 'কেরদানি' দেখাতেন, তখন বনবিহারী অতিষ্ঠ হয়ে 'বেপরোয়া'তে অপ্রিয় সমালোচনা করেন। আমরা তখন তাঁকে বলি, 'এগুলো নিছক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট জাতীয় জিনিস ; আপনি অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন ?' আরেক টিপ নস্য নিয়ে—এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র বদঅভ্যাস, আর ঐ করে করে করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সর্বনাশ—বললেন, 'তা হলে ছাপানো কেন ? যে প্রচেষ্টা রসের পর্যায়ে ওঠে নি সেটা প্রকাশ করে বিড়ম্বিত হওয়ার কি প্রয়োজন ?'

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথও বলতেন,

শতং বদ
মা লিখো

শতং লিখো
মা ছাপো।

* * *

আরো বহু স্মৃতি বার বার মনে উদয় হচ্ছে। একদা দুরারোগ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন। রিটায়ার করার বহু পরে তিনি একবার কলকাতায় এসে কি করে খবর পান আমি অসুস্থ। বিশ বছর ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। তিনি খবর পাঠালেন। সব শুনে বললেন, 'এ রোগ সারে না—তবু তুমি পরেশ চক্রবর্তীর কাছে যাও। আমি বহু ছেলে পড়িয়েছি—সব ব্ল্যাঙ্কো। ঐ একটি ছেলের আক্কেলবুদ্ধি ছিল। বিলেত থেকে ও নিয়ে এসেছে এ টু জেড বিস্তর ডিগ্রী।' আমি তাঁর কাছে গেলে সে ডাক্তার বলেন, 'গুরু এই প্রথম আমাকে একটি রোগী পাঠালেন। কি বলেছেন উনি? এ রোগ সারে না? না, সারে।' তিনি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে করে নয়। প্রথম ওষুধ দিয়েই। কিন্তু সে আরেক কাহিনী। এবং সবচেয়ে সন্তাপের কথা, এই কৃতবিদ্য চিকিৎসক অল্প বয়সে গত হন।

* * *

৫ই জুলাই বনবিহারী পঞ্চভূতে লীন হন।

সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ 'বনফুল' তাঁর সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার ১৫ই শ্রাবণ সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি পিটছে। আমি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে যা প্রকাশ করতে সক্ষম হই নি, তিনি অল্প কথাতেই সেটি মূর্তমান করেছেন।

"বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর (বনবিহারীর) দান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক সামাজিক কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনও তিনি রফা করেন নি। অনবদ্য তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে সে-সবের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন। সেকালের ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, বেপরোয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় তাঁর কীর্তি এখনও মণি-মুক্তার মতো ঝলমল করছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনমনীয় দুর্বার প্রকৃতির লোক। কখনও কারো অন্যায় সহ্য করতে পারেন নি। সুতরাং কারও সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন নি, কারো সঙ্গে তাঁর বনে নি। এজন্যে শেষ জীবনে প্রায় একা একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। অতিশয় বিচক্ষণ

চিকিৎসক ছিলেন। সিভিল সার্জন হয়ে বগুড়া থেকে রিটায়ার করেন।... পৃথিবীতে নিখুঁত মানুষ নেই, নিখুঁত মানুষের সন্ধানেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। কিন্তু কোথাও সে মানুষ পান নি। নিঃসঙ্গ জীবনই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর একটি ভাই তাঁকে ছাড়েন নি। বঙ্কুবিহারীই শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। শেষে তিনি নিজের ঠিকানাও কাউকে জানাতেন না। গত ৫ই জুলাই তিনি মারা গেছেন।"

বনফুলই তো চেনে বনবিহারীকে। আর এই 'বনবিহারী' নাম সার্থক দিয়েছিলেন তাঁর গুরুজন! জনসমাজে বাস করেও তিনি যেন সারাজীবন 'বনেই' 'বিহার' করলেন।

আমার আর মাত্র দুটি কথা বলার আছে।

বনবিহারী যে হিন্দু-সমাজ ও বাঙালীর কঠোর সমালোচনা করে গিয়েছেন তার কারণ এই নয় যে, তিনি এই দুটিকেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন। তিনি নিজকে প্রফেট বা রিফর্মার বলে মনে করতেন না। কাজেই বিশ্বভুবনের তাবৎ জাড্য দূর করার ভার আপন স্কন্ধে তিনি তুলে নেন নি। এমন কি তাঁর হাতের আলোটিও তিনি উঁচু করে তুলে ধরেন নি। সে-আলো তাই পড়েছিল মাত্র তাঁর আশপাশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্যের উপর। তারই মলিনতাটুকু তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন মাত্র। তবুও আমার মনে হয়েছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জ্যাঠামশাই' ও রলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্'-এর সমন্বয়—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্' বনবিহারীর অন্যতম প্রিয় পুস্তক (ডাক্তার হয়েও—সিরিয়াস ডাক্তাররা সাহিত্যচর্চার সময় পান কম—তিনি সম্পূর্ণ নিজের সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবো না)।

আজ তিনি জীবিত নেই, তাই বলবার সাহস পাচ্ছি, তিনি বাঙালীকে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় একথা বললে তিনি বোধ হয় আর আমার মুখ দর্শন করতেন না। বাঙালী বলতে তিনি হিন্দু—বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—মুসলমান, ইলিয়ট রোড অঞ্চলের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সকলকেই বুঝতেন।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটি নিবেদন করি। এ কথাটি তাঁর জীবিতাবস্থায় বললে তিনি সুনিশ্চিত রামদা নিয়ে আমার পশ্চাদ্দেশে ধাবমান হতেন।

ইংরিজিতে বলে—"মিক্স অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেস্।"

অনিচ্ছায় বলছি, কিন্তু এস্থলে বলার প্রয়োজন, আমি বিস্তর দেশ-বিদেশ

দেখেছি। বহু সমাজসেবী, হাসপাতাল চালক মিশনারি, রেডক্রসের একনিষ্ঠ সেবক কর্মী সর্বত্যাগী মহাজন, স্তালিনগ্রাদের বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রণাঙ্গন-প্রত্যাগত সার্জনকে আমি চিনি। বনবিহারীর হৃদয়ের অতিশয় গোপন কোণে যে ভুবন-জোড়া স্নেহমমতার ভাণ্ডার ছিল—সে রকম তো আর কোথাও দেখলুম না। সেই স্নেহমমতাই তাঁর আপন সুখশান্তি হরণ করেছিল। সেই বেদনাবোধই তাঁকে উত্তেজিত করতো খড়্গ ধারণ করে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

এই স্নেহমমতা তিনি এমনই সঙ্গোপনে রেখেছিলেন যে, অধিকাংশ লোকই তাঁর কঠোর ভাষা, তীব্র কণ্ঠ, নির্মম ব্যঙ্গ শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে। বনবিহারীর সেজন্য কণামাত্র ক্ষোভ ছিল না। তাঁর সহানুভূতি তিনি রাখতেন আরো গোপন করে।

আমরা বোধ হয় অত্যন্ত সহিষ্ণু। কিংবা যথেষ্ট ইতিহাস পড়ি নি। নইলে সোক্রাতেস খৃস্টের জন্য একদা যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বনবিহারীর জন্য সেটা করা হল না কেন?

কিন্তু এই অনুভূতিগত অভিজ্ঞতা গদ্যে প্রকাশ করা যায় না।

বনবিহারীর প্রয়াণ উপলক্ষ্যে 'বনফুল' যে সনেটটি লিখেছেন সেটি উদ্ধৃত করি :—

'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়'

পাষাণে আঘাত হানি, অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ল? কঙ্কর কণ্টক
জয়ী হ'ল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক-পদ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাঞ্ছিত করি' বিজয়-কেতন
আস্ফালন করিল আকাশে? অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি? না—না—নতি-নিবেদন
করি' পদে উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার
নহে ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহ্নি-কমল
তমোহন্ত্রী, হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অগ্নি তব অনির্বাণ, চির-সমুজ্জ্বল,
অনবদ্য অপরূপ ঊর্ধ্বমুখী শিখা।

মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছে শরপূর্ণ তূণ।

অদৃষ্টের রঙ্গরস

আওরেঙ্গজেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাবৎ ভারতবর্ষে লেগে গেল ধুন্ধুমার। বাদশাহ হবেন কে?

এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি যে, আর্য এবং একাধিক আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রথা—রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনা বাধায় সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তুর্কমানিস্তানের মোগলদের ভিতর এরকম কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তাদের ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার'। আরবদের ভিতর গোড়ার দিকে এই একই প্রবাদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট (খলীফা) নিযুক্ত হতেন, তবে 'জোরের' বদলে সেখানে ছিল চরিত্রের, শৌর্যবীর্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই বলা হ'ত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন খলীফা,—হন-না তিনি হাবশী (নিগ্রো)।' এবং সেটাও ঠিক করা হ'ত গণভোট দিয়ে।

তাই মোগল রাজা মারা যাওয়া মাত্রই, কিংবা তিনি অথর্ব অসমর্থ হয়ে পড়লেই লেগে যেত রাজপুত্রদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। কোনো কোনো সময় রাজার নাতিরাও এবং অন্য বাজে লোকও এই লড়াইয়ের লটারিতে নেবে যেতেন। অবশ্য রাজরক্ত না থাকলে তাঁর সম্রাট হবার সম্ভাবনা থাকতো না। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ফররুখসিয়ারের রাজত্বের শেষের দিক থেকে মুহম্মদ শাহ বাদশা রঙীলার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সিন্ধু দেশের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে সিংহাসনের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজার পর রাজাকে তাঁদের হাতে পুতুলের মত নাচতে হয়েছে। কিন্তু খ্যাতি, শক্তি, অর্থবলের মধ্যাহ্নগগনে থাকাকালীনও তাঁদের কারো তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসবার দুঃসাহস হয় নি। সৈয়দ পয়গম্বরের বংশধর,—তিনি সম্মান পাবেন মসজিদে, মক্তবে, মাদ্রাসায়—রাজসভায় কবিরূপে, ঐতিহাসিকরূপে—সমাজে গুরুরূপে, কিন্তু মোগল রাজবংশের রক্ত তাঁদের ধমনীতে ছিল না বলে দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান তাঁদের বাদশাহ-সালামৎরূপে কিছুতেই এঁদের স্বীকার করতো না। ঠিক ঐ একই কারণে মারাঠা ও ইংরেজ দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চায় নি। সিপাহ বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত ইংরেজ স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অধীশ্বরী বলে ঘোষণা করবার সাহস পায় নি। এবং সেটাও করেছিল অতিশয় সভয়ে।

রাজা বা সার্বভৌম আমীরের মৃত্যুর পর যুবরাজদের ভিতর ভ্রাতৃযুদ্ধের মারফতে কে সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা বের করা তুর্কমানিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশে প্রবল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভারতের (এবং অনেক সময় কাবুল কান্দাহার গজনীর উপরও দিল্লীর আধিপত্য থাকতো) মত বিরাট দেশে এ প্রকারের যুদ্ধ বিকট অরাজকতা ও দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করতো। লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় তো হ'তই,—অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর ক্রমাগত অভিযান ও পাল্টা অভিযান হওয়ার ফলে সেখানে চাষবাস হ'ত না, ফলে পরের বৎসর দুর্ভিক্ষ হ'ত। সাধারণজনের বাড়িঘরদোর তো নষ্ট হ'তই, কলাসৃষ্টির উত্তম উত্তম নিদর্শনও লোপ পেত। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই ইওরোপের তুলনায় এদেশে বেঁচে আছে অতি অল্প রাজপ্রাসাদ। কোনো কোনো স্থলে পলায়মান সৈন্য পথপ্রান্তের প্রতিটি ইঁদারাতে বিষ ফেলে যেত। ফলে বৎসরের পর বৎসর ধরে পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর একমাত্র জলের সন্ধান অব্যবহার্য হয়ে থাকতো।

এই দলাদলি মারামারি থেকে, কি দিল্লী-আগ্রার মত বৃহৎ নগর, কি সুদূর সুবের (প্রভিন্স্) ছোট শহর, আমীর-ওমরাহ, সিপাহসালার, ফৌজদার প্রায় কেউ নিষ্কৃতি পেতেন না। কারণ এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আহ্বান, আদেশ, অনুনয়-ভরা চিঠি পেতেন প্রত্যেক যুযুধান রাজপুত্রের কাছ থেকে—'আমাকে অর্থবল সৈন্যবল সহ এসে সাহায্য করো।' তখন প্রত্যেক আমীরের সামনে জীবনমরণ সমস্যা দাঁড়াতো—আখেরে জিতবে কোন্ ঘোড়াটা, ব্যাক্ করি কোন্‌টাকে? অতিশয় বিচক্ষণ কূটনৈতিকরাও রং হর্স ব্যাক্ করে আপন, এবং কোনো কোনো স্থলে সপরিবার, প্রাণ দিয়ে ভুলের খেসারতী দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ থাকবার উপায় ছিল না। মোগল রাজপুত্র মাত্রই ইংরিজি প্রবাদটাতে বিশ্বাস করতেন, 'ওয়ান হু ইজ নট্ উইদ্ মী ইজ্ এগেন্স্ট্ মি', যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে।

নির্ঝঞ্ঝাটে প্রতিষ্ঠিত বাদশাদের তো কথাই নেই, অতিশয় টলটলায়মান সিংহাসনে বসে দু'দিনের রাজাও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন সেপাই-শান্ত্রী, ফাঁসুড়ের দল—তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের উভয় চক্ষু অন্ধ করে দেবার জন্য—যেন তারা চিরতরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা না করতে পারে। শান্তিকামী, ধর্মাচরণে আজীবন নিযুক্ত, সিংহাসন আরোহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনেরও নিষ্কৃতি ছিল না। নিষ্কৃতি ছিল একমাত্র পন্থায়—আত্মীয়-স্বজন দেশ-দেশ ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তবে সেটাও

করতে হ'ত আগেভাগে পরিপূর্ণ শান্তির সময়। একবার ধুন্ধুমার লেগে যাওয়া মাত্রই তামাম দেশে এসে যেত এমনই অশান্তি, লুটতরাজ যে তখন আর বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরার উপায় থাকতো না। এমন কি পরিপূর্ণ শান্তির সময়ও আগেভাগে শেষ রক্ষা বাবদে কসম্ খাওয়া যেত না—মক্কাতে নির্বাসিত বাইরাম খান নাকি পথমধ্যে গুজরাতে আকবরের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

ইংরেজ ফার্সীতে লিখিত ইতিহাসরাজির সব কটাকেই গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে নিন্দাবাদ করে বলেছে, এ-সবেতে আছে শুধু লড়াই আর লড়াই। বিবেচনা করি, ওগুলোতে যদি গণ্ডায় গণ্ডায় শান্তিকামী পীর-দরবেশ ঘুরে বেড়াতেন, কিংবা তার চেয়েও ভালো হ'ত যদি রাজা-প্রজায় সবাই মিলে চাঁদনি চৌকে হাল্লেলুইয়া হর্ষরব তুলে ইংরেজের আগমনী গান ধরতেন, তাহলে বোধ হয় শ্বেত সমালোচকরা সন্তুষ্ট হতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলরা যে-ঐতিহ্য সঙ্গে এনেছিল সেটা তার বিকৃততমরূপে দেখা দিল তাদের পতনের সময়। ফলে স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হল তার সমাধান যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকরা সেসব যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে দি নেশন অব্ শপ্‌লিফটারসের জন্য সেই সৎকর্মের টেকনীক্ বয়ান করলে সত্যের অপলাপ হ'ত।

কিন্তু এসব ইতিহাস শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে ভর্তি ছিল একথা বললে আরেকটা খুব বড় সত্য গোপন করা হয়। এদের প্রচুর সাহিত্যিক মূল্যও যে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার পূর্বেই একটি সত্য স্বীকার করে নিই। বিদেশাগত কিছু লোক ভিন্ন এদেশের কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। এবং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে শত ভেল্কিবাজি দেখাতে পারলেও সেখানে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বও অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য যে উপাদানে নির্মিত হয় তার অভাব ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। তুলনা দিয়ে বলা যায়, রামায়ণের কাহিনী যত কাঁচা ভাষাতেই রচা হোক না কেন তার চিত্তাকর্ষণী শক্তি কিছু না কিছু থাকবেই।

তাই ফার্সী ভাষায় রচনাকারী ঐতিহাসিকরা হামেশাই কোনো বাদশার রাজত্বকালের তাবৎ লড়াই, বাদশার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্য আমীরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কূটনৈতিক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার মারপ্যাচ ইত্যাদি বর্ণনা করার পর পঞ্চমুখ হতেন বাদশার বিবাহের সালঙ্কার বর্ণনা দিতে; সেই উপলক্ষে সম্মিলিত কবিকুলের বর্ণনা দিতে, এবং সর্বশেষে বাদশার ব্যক্তিগত গুণাগুণের উল্লেখ করতে। সব সময় যে তাঁরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে সমর্থ হতেন তা নয়, কিন্তু

বাদশা সজ্জন হলে তাঁর গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতে কোনো অসুবিধাই উপস্থিত হ'ত না।

যেমন গুজরাতের এক বাদশা ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, পুণ্যশীল। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই গুণমুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর নাম দেন 'অল্-হালীম্'—'পুণ্যশীল'। মিরাৎ-ই-সিকন্দরী গুজরাতের প্রখ্যাত ইতিহাস। তার লেখক অল্-হালীমের সময়কালীন যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেবার পর পরমানন্দে হুজুর বাদশার সর্বপ্রকারের পুণ্যশীল খামখেয়ালির বর্ণন-পর্বে প্রবেশ করেছেন। কে বলবে তখন আমাদের এই ঐতিহাসিক শুধু যুদ্ধবিগ্রহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই উল্লাস বোধ করেন। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে প্রবেশ করার পর মনে হয় তাঁর যেন আর কোনো তাড়া নেই, মাথুরে পৌঁছনের পর কীর্তনিয়ার যে অবস্থা হয়। এ ইতিহাস তাঁকে যে একদিন শেষ করে 'তামাম্ শুদ্' লিখতে হবে সে ভাবনা তাঁর চৈতন্য থেকে যেন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

হুজুর অল্-হালীম্‌কে এক বিদেশাগত পাচক এক নূতন ধরনের পোলাও খাওয়ালে পর হুজুর পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে বললেন, 'উজীর। আমার প্রজারা কি কখনো-সখনো এরকমের পোলাও খায়?' উজীর স্মিতহাস্য করে বললেন, 'হুজুর, তা কখনো হয়!' হুজুর বললেন, 'একা একা খেয়ে আমি কেমন যেন সুখ পাচ্ছি নে।' হুকুম দিলেন, মহল্লা মহল্লায় বিরাট বিরাট পাত্রে করে যেন হুবহু ঐ রকমের পোলাও তৈরী করে তাবৎ আহমদাবাদবাসীদের খাওয়ানো হয়। আমাদের ঐতিহাসিকটি যেন ঈষৎ আমোদ উপভোগ করে ইঙ্গিত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হুজুরের এসব 'খামখেয়ালীর অপব্যয়' দেখে ভারী বিরক্ত হতেন।

তা সে যা-ই হোক তাবৎ আহমদাবাদবাসী সেদিন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দিনভর ফিস্টি খেলে। যে সাবরমতীর পারে বসে বহু যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচেছিলেন সেই সাবরমতীর পারে সেদিন আর কেউ ক্ষুধিত রইল না।

ঠিক ঐ রকমই দিল্লীর শেষ মোগলদের কোন্ এক বাদশার বিয়ের শোভাযাত্রায় উঁচু হাতীর পিঠ থেকে রূপো দিয়ে বানানো ফুল রাস্তার দু' পাশের দর্শকদের উপর মুঠো মুঠো ছড়ানো হয়। ঐতিহাসিক খাফী খান—কিংবা খুশ্-হাল্-চন্দ বা অন্য কেউ হতে পারেন, আমার মনে নেই—যখন তাঁর ইতিহাস লিখছেন তখন দিল্লীর বড় দুঃখের দিন। সেই জাঁকজমক শান্-শওকতের স্মরণে যেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'এ অধমও সেই দর্শকদের মধ্যে ছিল। সেও তার কুর্তার দামন্ (অগ্রভাগ, অঞ্চল) দু' হাত দিয়ে প্রসারিত করে

উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করলো। এ অধমের কী সৌভাগ্য, কী খুশ-কিস্মৎ! আম্মো তিনটে ছোট ছোট ফুল পেয়ে গেলুম। জয় হোক দিল্লীশ্বরের! জগদীশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!'

এ যুগের ইতিহাস বিষাদময়, কিন্তু ঘটনাবহুল বলে একাধিক ফার্সীজ্ঞ হিন্দুও তার সুদীর্ঘ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তার একটি ঘটনার বর্ণনা দেবার জন্য বক্ষ্যমাণ লেখেন। কিন্তু তৎপূর্বে এক লহমার তরে আহমদাবাদ ফিরে যাই।

মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ইতিহাস বলে, অল্‌-হালীম্‌ আহমদাবাদের দুর্দান্ত শীতে লক্ষ্য করলেন, গৃহহীনদের দুরবস্থা। আদেশ দিলেন যে, প্রতি চৌরাস্তায় যেন সন্ধ্যার পর কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো হয়। বহু গৃহহীন এমন কি গৃহস্থও সেই আগুন ঘিরে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গাল-গল্প, গান-বাজনা করে রাত কাটাতো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অল্‌-হালীম্‌ বৃহৎ আবাস নির্মাণ করে দিলেন—ভিখিরি-গরীবের বসবাসের জন্য। ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন, এ ধরনের 'পুয়োর হোম' পৃথিবীর এই সর্বপ্রথম কি না।

শীতে যাতে তারা কষ্ট না পায় তার জন্য লেপের ব্যবস্থাও হল। মিরাৎ-ই সিকন্দরীর লেখক বলছেন, 'কিন্তু এসব লক্ষ্মীছাড়া ভ্যাগাবণ্ডদের কেউ কেউ আপন আপন লেপ বিক্রী করে দিয়ে মদ খেত। খবরটা কি করে জানি হুজুরের কানে গিয়ে পৌঁছল।' আমার মনে সন্দেহ হয়, হয়তো বা আমাদের সেই সিনিক প্রধানমন্ত্রী উজীর-ই-আজম্‌ সাহেবই মজা চেখে চেখে বাঁকা নয়নে তাকিয়ে হুজুরের অপব্যয়ের চরম পরিণামটি হুজুরেরই খেদমতে পেশ করেন!

তিনি নিজে করে থাকলে সেটা বুমেরাঙের মত তাঁরই কাছে ফিরে আসে। হুজুর বললেন, 'এটা কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো উজীর।' উজীর অন্য-দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভাবখানা করলেন, স্বাধীন সম্ভ্রান্ত আসমুদ্র রাজস্থানব্যাপী গুর্জরভূমির মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধানমন্ত্রী 'নেপক্যাতা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না! হুজুর কিন্তু উজীরের অতশত সূক্ষ্মানুভূতির পশ্চাদ্ধাবন করেন না। বললেন, 'রাতটা ভেবে দেখো।' উজীর-ই-আলা যে ভাবে কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন তাতে মনে হল না যে, তিনি ত্রিযামা-যামিনী অনিদ্রায় যাপন করবেন।

পরদিন ফজরের নমাজের পরই, অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রীর তলব পড়লো। হুজুর সহাস্য আস্যে তাঁকে বললেন, 'বুঝলে হে উজীর সাহেব, আমিই কাল রাত্রে চিন্তা করে দাওয়াইটা বের করেছি। প্রত্যেককে আলাদা লেপ না দিয়ে চার-চারজনকে এক-একটা করে বড় লেপ দাও। চারজনই তো আর

মদের গোলাম হবে না যে এক জোট হয়ে লেপ বিক্রী করে দেবে। যারা খায় না তারা ঠেকাবে।'

এ ধরনের চুটকিতে মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ভর্তি। তাছাড়া দীর্ঘতর কাহিনীও এ কেতাবে আছে। এমন কি বিশাল বিরাট বীরপুরুষ মুহম্মদ বেগড়ার (এর গোঁপ নাকি এতই দীর্ঘ ছিল যে তিনি তার দুই প্রান্ত মাথা ঘুরিয়ে পিছনে এনে ঘাড়ের উপরে গিঠ বেঁধে রাখতেন!) যৌন জীবনও তিনি নির্বিকারচিত্তে সালঙ্কার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রাদেশিক ইতিহাস বলে এ কেতাব তার ন্যায্য মূল্য পায় নি।

শেষ মোগলদের ইতিহাসে একটি অতিশয় হতভাগ্যের জীবন ও একটি ঈষৎ হাস্যরস-মিশ্রিত ঘটনা—এই দুটি আমার মনে আসে। পুজোর বাজারে অন্য পত্রিকায় একটা করুণ রস লিখে আমার রেশন খতম। দ্বিতীয়টাই শুনুন।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোগলসম্রাট মাত্রেরই মৃত্যু হলে রাজপুত্রদের ভিতর লাগত যুদ্ধ। আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও তার ব্যতিক্রম হল না। লড়াই জিতে বাদশাহ হলেন শাহ আলম বাহাদুর শাহ। পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র জাহান্দার শাহ তখ্‌তে বসলেন। মোগল বংশের উপর আর কেউ এঁর মত কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নি। একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। একটি বাইজী—লাল্‌কুনওর্‌কে তিনি দিয়েছিলেন বেগমের সম্মান ও তাঁকে নিয়ে বেরোতেন দিল্লীর প্রকাশ্য রাস্তায় মদ্যপান করতে।[১] তখনকার দিনে আজকের পানওলার দোকানের মত মদের দোকান থাকতো—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোঁ করে এক পাত্র মদ্যপান করে ফের অন্য দোকানে আরেক পাত্র—করে করে বাড়ি পৌঁছনো যেত। কিংবা রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া যেত। হুজুর বাদশাহ সালামৎ সেই বাইজী লাল্‌কুনওরের পাশে দাঁড়িয়ে এইসব অতি সাধারণ শ্রেণীর দোকান

---

১ এ যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হিটলারের প্রধান সেনাপতি ব্লমবের্ক বৃদ্ধ বয়সে ভালো করে অনুসন্ধান না করে তাঁর স্টেনোকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ ইনি একদা একাধিক শহরে দেমি-মঁদেন ছিলেন। বিয়ের রাত্রে পৃথিবীর ঐ সর্বপ্রাচীন ব্যবসায়ের মেয়েরা তাদের পাড়ায় পাড়ায় বিয়েটা সেলেব্রেট করে—যেন তারা সমাজে কল্কে পেয়ে গেল—এবং শুধু তাই না, যে-সব পুলিস তাদের উপর চোটপাট করতো তাদের ফোন করে তাদের হেলথ্‌ ড্রিঙ্ক করে। পরে হিমলার দলীল-দস্তাবেজসহ হিটলারের কাছে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করলে পর তিনি ব্লমবের্ককে রিটায়ার করতে আদেশ দেন।

ও তাদের খদ্দেরের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে করতে পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢালতেন এবং লাল্‌কুনওরের তো কথাই নেই। তিনি একদা যে হাফ-গেরস্থ অঞ্চলে (ফরাসীতে হুবহু একেই বলে 'দেমি-মঁদ', এদের স্ত্রীলোক বাসিন্দা 'দেমি-মঁদেন') তাঁর ব্যবসা চালাতেন, সেখানকার লোফাররা এসে সেখানে জুটতো। বাদশা সালামৎ দরাজ দিলে ঢালাই পাইকিরি হিসাবে মদ্য বিতরণ করতেন। তখনকার দিনে দিল্লীর বাদশারা বয়েলের গাড়ি চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। তার ড্রাইভারও সেই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক পানোৎসবে অপাংক্তেয় হয়ে রইত না। রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আমীর-ওমরাহ হঠাৎ এসে পড়লে পাল্কি ঘুরিয়ে নিতেন ; পদাতিক ভদ্রজন এই বেলেল্লাপনার মাঝখানে পড়ে বিব্রত না হওয়ার জন্য গুত্তা মেরে ডাইনে বাঁয়ের কোনো দোকানে আশ্রয় নিতেন।

মুসলমান শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। অবশ্য দেশবাসী জানতো যে রাজা বাদশারা এ আইনটি এড়িয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোলাখুলি-ভাবে সচরাচর মদ্যপান করতেন না। এ যুগে রাজা ফারুক প্রায় জাহান্‌দার শা'র মত আচরণ করে কাইরোর জনসাধারণের আক্কেল গুড়ুম করে দেন। রোজার মাসে—আবার বলছি উপবাসের মাসে তিনি তাঁর নিত্যপরিবর্তিত দেমি-মঁদেন নিয়ে প্রশস্ত দিবালোকে এক 'বার' থেকে আরেক 'বারে' ঘুরে বেড়াতেন—মাতা এবং প্রাসাদের অন্যান্য মুরুব্বীদের সর্ব সদুপদেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। এঁরই পরিত্যক্তা এক দেমি-মঁদেন প্রেয়সী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই 'মহাপুরুষটি' গুরুভোজন বা অত্যধিক পানের ফলে গতাসু হবেন। বহ্বান্ন ভক্ষণ করে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ইনি অধুনা রোম শহর থেকে সাধনোচিত ধামে গেছেন—ঝিনুকের ভিতরকার বস্তু মাত্রাধিক খাওয়ার ফলে।

তা যা-ই হোক্, জাহান্‌দার শাহ একদিন ইত্যাকার রোঁদ মারতে মারতে বেএক্তেয়ার হয়ে যান—না হওয়াটাই ছিল ব্যত্যয়—এবং আধামাতাল গাড়োয়ান হুজুর ও লাল্‌কুনওরকে কোনো গতিকে গাড়িতে তুলে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়ে লালকেল্লা পানে গাড়ি চালায়। বয়েল দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের। পথ চিনে সোজা কেল্লার ভিতরে প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লাল্‌কুনওর টলতে টলতে প্রাসাদে ঢুকলেন। বয়েল দুটো চললো—আপন মনে বয়েলখানার দিকে, কারণ গাড়োয়ান সম্পূর্ণ বেহুঁশ।

ঘণ্টাখানেক পরে পড়ল খোঁজ খোঁজ রব। বাদশা কোথায়, বাদশা কোথায় ? এ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। খবরটা যদি রটে যায় তবে বাদশার যে-

কোনো ভাই, চাচা, ভাতিজা নিজেকে রাজা বলে অবশ্যই ঘোষণা করবেন এবং তাহলেই তো চিত্তির। বিরাট লালকেল্লা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু হুজুর যেন মহাশূন্যে অন্তর্ধান করেছেন।

তখন এক সুবুদ্ধিমানের মাথায় অলৌকিক অনুপ্রেরণা এল। এক মাইল দূরের বয়েলখানাতে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, হুজুর অঘোর নিদ্রায়, গাড়োয়ানও তদ্বৎ।

বলা বাহুল্য, পথচারী মদ্যপায়ী মহলে হুজুর অতিশয় জনপ্রিয় হলেও আমীর-ওমরাহ—মায় প্রধানমন্ত্রী, যদিও তিনি জানতেন; জাহান্দারশাহ তখ্‌ৎ-হীন হলে তাঁরও নবীন রাজার হাতে জীবন সংশয়—সকলেই তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ওদিকে দুই প্রধান আমীর সিন্ধু দেশের সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী ব্যাক করছেন অন্য ঘোড়া—জাহান্দারশাহের ভ্রাতা আজীম্ উশ্-শান-এর পুত্র সুদর্শন, সুপুরুষ—বলা হয় তৈমুরের বংশে এরকম বলবান সুপুরুষ আর জন্মান নি—ফররুখ সিয়ারকে। তাঁরা দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়েছেন সিংহাসন অধিকার করতে। যুদ্ধে জাহান্দার পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। সিংহাসন হারিয়ে তিনি যত না শোক প্রকাশ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন, বার বার বেদনাতুর, মিনতিভরা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে, 'আমার লাল্‌কুনওরকে আমার কাছে আসতে দাও, দয়া করে লাল্‌কুনওরকে আসতে দাও।' সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তখনই তাঁদের স্বরূপ দেখাতে আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ তাঁরা গ্ল্যাডস্টোনের মত কিংমেকারস্, তাঁরা রাজা ম্যানুফেকচার করেন—লাল্‌কুনওর অনুমতি পেলেন জাহান্দার-এর বন্দীজীবনের সাথী হওয়ার।

অধম শুধু পটভূমিটি নির্মাণ করছে; নইলে জাহান্দার শাহ বা ফররুখ সিয়ার কেউই আমার লক্ষ্য প্রাণী নন। তবু ফররুখ সিয়ার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলতে হয়। ইনি বুদ্ধি ধরতেন কম, এবং যে কূটনীতিতে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেইটে প্রয়োগ করতে চাইতেন দুই ধুরন্ধর পক্কসিদ্ধ, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যজন প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করে বাদশাহ সালামৎকে প্রায় উপেক্ষা করে রাজত্ব চালনা করতে লাগলেন। নানাপ্রকার মেহেরবানী বণ্টন করে দুই ভাই শক্তিশালী আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠী নির্মাণ করলেন এবং প্রত্যক্ষত সন্দেহ রইল না যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে যাই করুন না কেন, শাহী ফৌজ তাঁদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করবে না। বেচারা বাদশাহ ক্রমেই ক্ষমতা হারাতে লাগলেন এবং শেষটায় চেষ্টা দিলেন, যেসব ভাগ্যান্বেষী অ্যাডভেনচারাররা ইরান তুরান থেকে দিল্লী আসত তাদের নিয়ে একটা দল সৃষ্টি করতে।

একদা এঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যকার কৃতবিদ্য কিংবা রণবিশারদ তাঁরা দিল্লী দরবারে ও জনসাধারণের ভিতর সম্মান পেতেন। কিন্তু পাঁচশত বৎসর মোগল রাজত্ব চলার পর দিল্লীর খাসবাসিন্দা মুসলমান ও হিন্দুগণ একটা জোরদার 'স্বদেশী' পার্টি তৈরী করে ফেলেছিলেন। সৈয়দ ভাইরা ছিলেন এ দলের নেতা। (দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের ঐতিহাসিকরা এই 'স্বদেশী' দলের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নি; আর ইংরেজ ঐতিহাসিক অবশ্যই চাইতো না যে এরই অনুকরণে নিত্য নবাগত ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীদের বিরুদ্ধে ভারতে একটা 'স্বদেশী' পার্টি গড়ে উঠুক)।

নিরুপায় হয়ে ফররুখ সিয়ার তাঁর শ্বশুর যোধপুরের রাজা অজিত সিংকে দিল্লীতে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠালেন। কারণ তখন তিনি সত্যই বুঝে গিয়েছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে আর বেশী দিন বরদাস্ত করবেন না। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্য ক্রীড়নক তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসাবেন।

অজিত সিং দিল্লী পৌঁছনো মাত্রই সৈয়দরা তাকে সংবর্ধনা করতে অগ্রসর হলেন—বাদশা সালামৎ তখন কার্যত লালকেল্লায় বন্দী। তাঁরা ঐ 'স্বদেশী' বিদেশীর জিগিরটি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন। অজিত সিংও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, সৈয়দদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মত শক্তি তাঁর নেই। ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করা বাবদে তিনি সম্পূর্ণ সম্মতি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

সৈয়দদ্বয় ফররুখ সিয়ারকে ধরে আনবার জন্য অন্দরে সৈন্য পাঠালেন। হারেমে রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তুর্কী রমণীদের সাহস যথেষ্ট, নূরজাহান জাহানারা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে তাবৎ ভারত শাসন করেছেন, কিন্তু এঁদের ভিতর কেউ সে রকম ছিলেন না, কিংবা হয়তো দম্ভী ফররুখ সিয়ার এঁদের মন্ত্রণায় কর্ণপাত করেন নি। অবশ্য তাঁকে সবলে টেনে আনতে দূতদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর শরীরে ছিল অসাধারণ বল।

সৈয়দদ্বয়ের সামনে তাঁকে আনা হলে তাঁদের একজন আপন কলম-দান খুলে, চোখে সুরমা (কাজল) লাগাবার শলাকা ঘাতকের হাতে দিলেন। ফররুখ সিয়ারকে সবলে চিৎ করে ফেলে অন্ধ করা হল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ঐ নিষ্ঠুর কর্ম যে করেছিল সে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে নি—সে ভেবেছিল,

বলা তো যায় না, হয়তো একদিন তিনি আবার রাজা না হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন, তখন সে মৃত্যুদণ্ড তো এড়াবেই, হয়তো বা বখশিশও পেতে পারে। ফররুখ সিয়ারকে নহবৎখানায় বন্দী করে রাখা হল। লালকেল্লার আজকের দিনের প্রধান প্রবেশপথ ও দেওয়ান-ই-আম-এর মাঝখানে এটা পড়ে।

ওদিকে কিন্তু দিল্লীর অন্য এক মহল্লায় এক ভিন্ন কমেডি শুরু হয়েছে।

সৈয়দদ্বয় অনেক চিন্তা ততোধিক তর্কবিতর্ক আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, ফররুখ সিয়ারের খুড়ো রফী-উশ্-শানের (ইনি আজীম্-উশ্-শানের পরের ভ্রাতা—আওরেঙ্গজেবের দৌহিত্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ মুহম্মদ ইব্রাহীমকে সিংহাসনে বসানো হবে। সেই মর্মে দূত পাঠানো হয়েছে রফী-উশ্-শানের হাভেলিতে। সেখানে ইব্রাহীম তাঁর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ বাস করেন।

দূতের দল উপস্থিত হওয়া মাত্রই হাভেলিতে উচ্চৈঃস্বরে বামাকণ্ঠের ক্রন্দন রোদন চিৎকার অভিসম্পাত আরম্ভ হল।

কারণটা সরল। কয়েকদিন ধরেই দিল্লী শহর শত রকমের গুজবে ম-ম করছে। ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হলে হতেও পারেন—যদিও অনেকেই প্রাণপণ আশা করছিলেন, অজিত সিং যাই করুন, আপন জামাতাকে সিংহাসন-চ্যুতি থেকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর নিধন অবধারিত ও দিল্লীবাসীদের কাছে যে ব্যক্তি পুত্রকে হত্যা করে তার চেয়েও ঘৃণ্য—যে তার মেয়েকে বিধবা হতে দেয়। •(কিছুদিন পর ফররুখ সিয়ার নিহত হওয়ার পর অজিত সিং রাস্তায় বেরোলেই তাঁর সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার ছোঁড়ারা তাঁর পাল্কীর দুই পাশে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে ঐক্যতান ধরতো, 'দামাদকুশ, দামাদকুশ'—জামাতৃহন্তা, জামাতৃহন্তা! পুত্রকে হত্যা করে কেউ এভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে আমার স্মরণে আসছে না।)

ফররুখ সিয়ার সিংহাসন হারালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কার প্রতি 'নেক্-নজর' —অবশ্য যে-ই রাজা হোন তাঁকে হতে হবে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে পুত্তলিকা মাত্র—পড়বে তার কিছু স্থিরতা ছিল না। দূতরা তাই যখন হাভেলির সামনে এসে সুসংবাদ দিলে, তারা এসেছে সমারোহ সহকারে নবীন রাজা মুহম্মদ ইব্রাহীমকে তাঁর অভিষেকের জন্য নিয়ে যেতে, তখন সবাই নিঃসন্দেহে ভাবলে এটা একটা আস্ত ধাপ্পা। আসলে আর কেউ বাদশা হয়ে দূত পাঠিয়েছেন ইব্রাহীমকে ছলে বলে পকড় করে নিয়ে গিয়ে হয় হত্যা করতে, নিদেন অন্ধ করে দিতে—যাতে করে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়; এ রেওয়াজ তো রাস্তার ভিখিরি পর্যন্ত জানে, জানবে না শুধু রাজবাড়ির হারেমের মহিলারা! তওবা! তওবা!!

বিরাট বাড়ি। বিস্তর কুটুরি, চিলেকোঠা। তদুপরি এসব কারবার তো দিল্লী শহরে হামে হাল লেগেই আছে। তাই দু-চারটে গুপ্তঘর, পালিয়ে যাবার সুড়ঙ্গও যে নেই, এ-কথাই বা বলবে কে? হারেম-মহিলারা তড়িঘড়ি ইব্রাহীম ও তার ছোট ভাই রফী উদ্-দৌলাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললেন তার সন্ধান পেতে—আদৌ যদি পাওয়া যায়—লাগবে সময়। ওদিকে দূতদের পই পই করে বলা হয়েছে, তারা যাবে আর আসবে, ছররার মত দ্রুতবেগে, এবং পথমধ্যে যেন তিলার্ধকাল বিলম্ব না করে। কারণটি অতিশয় স্বপ্রকাশ। দিল্লী শহরের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পর্যন্ত জানে, একবার যদি খবর রটে যায় এবং সেটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়—যে ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন এবং সে সিংহাসন তখনো শূন্য তা হলে আওরেঙ্গজেব-বংশের যে কোন রাজপুত্র দুঃসাহসে ভর করে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দেবে। সৈয়দ-ভায়ারা বিলক্ষণ জানতেন যে, যদিও আমীর-ওমরাহ সোওয়ার-সেপাই তাঁদের পক্ষে, তবু এ তত্ত্বটি ভুললে বিলকুল চলবে না যে, ফররুখ সিয়ার ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্রাট। তারপর আরেকটা কথা। আওরেঙ্গজেবের এক বংশধর যদি অন্য বংশধরকে খেদিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন, তবে জনসাধারণ হয়তো কোনো পক্ষই নেবে না। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তো কোনো রাজাদেশে, সিংহাসনে হক্কধারী কোনো রাজপুত্রের হুকুমে বাদশাহ ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করেন নি! তাঁরা কে? আসলে সিন্ধু প্রদেশের দুই ভাগ্যান্বেষী। একজন ফররুখ সিয়ারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যজন প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ তাঁর কর্মচারী এবং তাঁরই নুনেনমক খেয়েছেন অন্তত ছ'টি বছর ধরে। তাই মনিবকে সিংহাসনচ্যুত করে এঁরা যে অপকর্মটি করলেন এটা নেমকহারামীর চূড়ান্ত! দিল্লীর জনসাধারণ উজবুক নয়। তারা যদি ক্ষেপে যায় তবে সৈন্য-সামন্ত নিয়েও দিল্লীকে ঠাণ্ডা করা রীতিমত মুশকিল হবে।

অতএব সৈয়দদের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন, তড়িঘড়ি আওরেঙ্গজেবের কোন সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আইনত এবং ঐতিহ্যগত পন্থায় দিল্লীর রাজভক্ত প্রজাগণকে মোকাবেলা করা।

কিন্তু দূতরা গুপ্তঘরের সন্ধান পাবে কি করে? বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে চাইলে বেরালটা পর্যন্ত মারমুখো হয়ে ওঠে। এরা আবার তুর্কী রমণী—যুগ যুগ ধরে ইয়া তাগড়া তাগড়া মর্দকে কড়ে আঙুলের চতুর্দিকে ঘুরিয়েছে।

অবশ্যই পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ফররুখ সিয়ারকে হারেমের ভিতর থেকে ধরে আনা গেল, আর এখন এই চ্যাংড়াটাকে কাবু করা যাচ্ছে না?

ব্যাপারটা সরল। ফররুখ সিয়ারের হারেমের তুর্কী রমণীরা যে বাদশার সঙ্গে

সঙ্গে সর্ব সম্মান হারিয়ে বসেছেন। এরা বাধা দিলে সেপাইরা তাদের উপর প্রয়োগ করবে পশুবল। এরা জানে দুদিন বাদেই এইসব নিষ্প্রভ, হতজ্যোতি, লুপ্তসম্মান সুন্দরীদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে 'সোহাগপুরা'তে। আল্লা জানেন, কোন্ কাষ্ঠরসিক এই পরিত্যক্তা রমণীদের দীনদরিদ্র নির্লজ্জভাবে অবহেলিত শেষ আশ্রয়স্থলকে 'সোহাগপুরা' নাম দিয়েছিল। এরা সেখানে পাবেন সেফ গ্রাসাচ্ছাদন। তার বীভৎস বর্ণনা থেকে আমি পাঠককে নিষ্কৃতি দিলুম।...কিন্তু যে ইব্রাহীম এখন রাজা হতে চললেন তাঁর মুরুব্বীদের তো ভিন্ন শিরঃপীড়া!

তাই নূতন রাজাকে আনতে গিয়ে দূতদের প্রাণ যায়-যায়। মরীয়া হয়ে তাঁর মা, মাসী, জ্যেঠি, খুড়ি এক কথায় তাবৎ রমণীরা আরম্ভ করেছেন দূতের গুষ্টীকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতে। ছেঁড়া জুতো, খোঁচা খোঁচা খ্যাংরা-খররা, হেন বস্তু নেই যা দিয়ে তাঁরা ওদের পেটাতে কসুর করছেন। বেচারীরা খাচ্চে বেদরদ মার, দু'হাত দিয়ে যতখানি পারে সে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছে। একখানা কাঠির ঝাঁটার সপাং করে মুখের উপর মার—সেটা কোন্ জঙ্গীলাটের কোন্ অস্ত্রের চেয়ে কম! বেচারীরা এঁদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ঠেলাটি পর্যন্ত দিতে পারে না। কালই তো এঁরা লালকেল্লার প্রাসাদে গিয়ে আবাস নেবেন। তখন বেচারীদের হালটা হবে কি? খুদ বাদশা সালামতের পিসিকে মেরেছিল ধাক্কা, খুড়িকে মেরেছিলে কনুই দিয়ে গুত্তা—বেয়াদবী বেতমিজী তবে আর কাকে বলে! বন্দ্ করো ব্যাটাদের পিঞ্জরা মেঁ, ঝুলিয়ে রাখো বদমাইশদের লাহোরী দরওয়াজার উপর! সৈয়দ-ভায়ারা কি তখন আর তাদের স্মরণে আনবেন!

এই একতরফা জেনানা আক্রমণ, তথা গৃহনির্মিত সাতিশয় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের দফে দফে বয়ান প্রত্যেক ঐতিহাসিক দিয়েছেন বড়ই প্রেমসে। এই মারপিটের বর্ণনাতে পৌঁছে এ যুগের ঐতিহাসিকরা ভাবেন, তাঁরা যেন বেহেশ্তে পৌঁছে গেছেন—নড়বার নামটি পর্যন্ত করেন না।

আর আর্ত চিৎকার উঠছে সম্মার্জনী-লাঞ্ছিত হতভাগ্যদের—'দোহাই আল্লার, কসম আল্লার, পয়গম্বর সাক্ষী, আমরা কোনো কুমৎলব নিয়ে আসি নি। আমরা এসেছি হুজুরকে তাঁর ন্যায্য তখ্তের উপর বসাতে।' কিন্তু অরণ্যে রোদন আর জনারণ্যে রোদনে ফারাক থাকলে জনসমাবেশকে 'অরণ্য' নাম দেওয়া হল কেন?

ওদিকে দুই 'কিং-মেকার্স' বা রাজা নির্মাণের রাজমিস্ত্রি মহা প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী লালকেল্লার দিওয়ান-ই-আম-এর

ভিতর বসে আছেন যেন কাঠ-কয়লার আগুনে আঙ্গিঠার উপর। দূতের পর দূত পাঠিয়ে যাচ্ছেন রফী-উশ্-শানের হাভেলীতে, কিন্তু সে যেন সিংহের গুহাতে মানুষ পাঠানো। কেউই আর ফিরে আসে না। যে যায়, সে-ই ঝাঁটা-পেটার দ'য়ে লীন হয়ে যায়, কিংবা রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'অগুরুচন্দন-ঠারের ভাষায়' বোঝাতে চেষ্টা করে যে, প্রতিটি মুহূর্ত জীবন-মরণ সমস্যা সঙ্কটময় করে তুলছে। ভিতরে একপাল লোক ছুটেছে গুপ্তঘরের সন্ধানে, তাদের পিছনে ছুটেছে জেনানা-রেজিমেণ্ট পেটিকোট-পল্টন আসমান-ফাটানো চিল্লি-চিৎকার করতে করতে। সর্বপ্রকারের সংগ্রামানভিজ্ঞ আপনাদের সেবক, এই দীন লেখক, তাঁদের হাতে যে সব মারণাস্ত্র আছে, তাঁদের রণকৌশল, ব্যূহনির্মাণাদির আর কী বর্ণনা দেবে? বাবুর্চিখানার খুন্তি সাঁড়াশী থেকে আরম্ভ করে সেই মোগল যুগে কত কি থাকতো তার বর্ণনা দেব নিরীহ বাঙালী, আমি! মাশাল্লা!

চতুর্দিকে, আকাশে-বাতাসে সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনা, দ্রুতগতিতে ধাবমান বহুবিধ নরনারী, চিৎকার আর্তরব, আল্লার শপথ, রসুলের নামোচ্চারণ, হজরৎ আলীর অনুকম্পার জন্য করুণ ফরিয়াদ, মহরমের দিনের ইমাম হাসন-হুসেনের ঝাণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি হেন, এমন সময়—

এমন সময় অতি ধীরে ধীরে একটি বালক—বালকই বটে, কারণ সে অজাতশ্মশ্রু অজাতগুম্ফ—ঐ যে হোথা মুদির দোকান দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই হাভেলির সামনে এসে একবার মাত্র সেই হুলস্থূল কাণ্ডের দিকে একটা শান্ত দৃষ্টি ফেলে বাড়িতে ঢুকলো। তার পরনে সুনময়লা সুতির পাজামা, তার উপর একটা অতি সাধারণ কুর্তা। মাথায় টুপিটি পর্যন্ত নেই, পায়ে চটি আছে কি না ঠিক ঠাহর হল না। সে কুর্তার সামনের দিকটার (পূর্বোল্লিখিত 'দামন' বা অঞ্চল) দুই খুঁট দুই হাত দিয়ে এগিয়ে ধরে তাতে সামলে রেখেছে পায়রাকে খাওয়াবার দানা। স্পষ্ট বোঝা গেল, এইমাত্র পাড়ার মুদির দোকান থেকে সে বেসাতিটা কিনে এনেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, হট্টগোলের উৎপাতে পায়রাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন তার খেয়াল গেল চতুর্দিকের ছুটোছুটি আর চেল্লাচেল্লির দিকে। সে কিন্তু নির্বিকার। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলো—বাড়িটা যেন চাঁদনি চৌক।

এবারে বাইরে শোনা গেল এক পদস্থ অশ্বারোহীর কটুবাক্য আর তীব্র চিৎকার—ইনি অন্ততপক্ষে ফৌজদারই হবেন। 'ওরে সব না-মর্দ, বেওকুফ, বেকার নাকম্মার দল। এই এখ্খুনি বেরিয়ে আয়, কাম খতম্ করে। নইলে হজরৎ আলীর ঝাণ্ডার কসম খেয়ে বলছি, তোদের কিয়ামতের শেষ-বিচারের

দিন এই লহমাতেই হাজির হবে। আল্লার গজব, আল্লার লানৎ তোদের উপর, তোদের বাল্-বাচ্চার উপর।'

এই হুঁশিয়ারী, এই দিব্যিদিলাশা যেন তিলিস্‌মাৎ-ভানুমতীর কাজ করলো।

দূতদের দুজনার দৃষ্টি হঠাৎ গেল সেই দামনে-দানা-ভরা বালকটির দিকে। লাফ দিয়ে পড়লো সেই দুই নরদানব তার উপর। এক ঝটকায় তাকে কাঁধে ফেলে দে-ছুট দে-ছুট দেউড়ির দিকে, দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে আল্লায় মালুম কোন দিকে! কি যে ঘটলো কিচ্ছুই বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো বামাকুলের আর্তনাদ—'ইয়াল্লা, এরা যে রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে গেল রে। ধরো, পাকড়ো ওদের। পাকড়ো, পাকড়ো, জানে ন্ পায়, যেতে না পায় যেন! ইয়া রহ্‌মান, ইয়া রহীম!'

কিন্তু কে ধরে তখন কাকে?

হারেমের মেয়েরা ভাবতেই পারেননি যে রফী-উশ্-শানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নাবালক বাচ্চা রফী-উদ্-দরজাৎকে ধরে এরা চম্পট দেবে। যতক্ষণ এরা জেনানা জঙ্গীলাট হয়ে সার্বভৌম মহম্মদ ইব্রাহীম আর মধ্যম রফী উদ্-দৌলাকে পঞ্চত্ব, কম্‌সেকম্ অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করছিলেন, ততক্ষণে, যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না, সেই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে 'দুশমন' উধাও হয়ে গিয়েছে।

আজব সেই লড়াই তাজ্জবভাবে ফৌরন্ থেমে গেল। দোস্ত দুশমন কোনো পক্ষের কেউ মারা গেল না, হার মানলো না, সন্ধি করলো না, ধরা দিল না—আচানক্ সবকুচ্‌হ্ বিলকুল ঠাণ্ডা!

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিওয়ান-ই-আম্ থেকে নহবৎখানা পর্যন্ত পাইচারির বদলে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছেন। এঁরা বিস্তর লড়াই লড়েছেন, জীবন এঁদের বহুবার বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারে তাঁরা যে রকম ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে গেলেন এরকমটা আর কখনো হন নি। ক্রোধে, জিঘাংসায় তাঁরা শুধু একে অন্যকে বলছেন, যে-কটা না-মর্দকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের জ্যান্ত শরীর থেকে চামড়া তোলবার হুকুম দেবেন, নয় ফোঁটা ফোঁটা গরম তেল তাদের ব্রহ্মতালুতে ঢেলে ঢেলে নিধন করবেন।

এমন সময় সেই দুই পাহলোয়ান এসে উপস্থিত শাহজাদা রফী উদ্-দরজাৎকে সঙ্গে নিয়ে।

শাহজাদা হোক আর ফকীরজাদাই হোক, সে কিন্তু পুঁটুলি পাকিয়ে দু হাত দিয়ে জোরে পাকড়ে আছে পায়রার দানা-ভর্তি তার কোঁচড়। এসব বাদশা-

উজীরের ব্যাপার দিল্লী শহরে এখন আছে তো তখন নেই—কিন্তু পায়রার দানা কটি পায়রার দানা, শাহজাদা মিয়া রফীর কাছে এটা ভয়ঙ্কর সত্য।

ইতিমধ্যে সৈয়দ ভায়ারা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন, 'কম্‌বখ্‌ৎ, না-দান্‌—এ কাকে ধরে এনেছো তোমরা? বাদশা হবেন বড় ভাই, ধরে আনলে ছোটটাকে। তোমাদের জ্যান্ত না পুঁতলে—'

সৈয়দদ্বয় তখন নাগরিক, ফৌজদার এমন কি তৈমুরের বংশধর, বাবুর-হুমায়ুনের পুত্র-পৌত্র বাদশাহ-সালামৎদের ও জান-মালের মালিক। এ সব কথা দূত দুটি ভালো করেই জানে। কিন্তু আজকের ঝাঁটার মার তাদের করে দিয়েছে বেপরোয়া। চরম বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হন। আর আমাদের মারুন আর কাটুন, যা খুশী করুন।'

দুই ভাই তাড়াতাড়িতে ব্যাপারটা জানতে পেরে বুঝলেন, এখন আবার নূতন করে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বড় দুই ভাইয়ের একজনকে—তাঁরা ইব্রাহীমের চেয়ে রফী উদ্‌-দৌলাকেই পছন্দ করেছিলেন বেশী—ধরে আনাতে সময় লেগে যাবে বিস্তর। আজকের ভাষায় ততক্ষণ টাইম-বম্‌ ফেটে যাবে!

একে দিয়েই তা হলে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। গত্যন্তর কি?

আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? ইব্রাহীমই হোক আর রফী উদ্‌-দৌলাই হোক, যেই হোক, তাকে তো হতে হবে ওঁদের হাতেরই পুতুল। সে পুতুল তার মায়ের গর্ভ-ফ্যাক্টরি থেকে পয়লা চালানে বেরিয়েছে, না তেসরা কিস্তিতে তাতে কীই বা যায় আসে? ফরাসী সম্রাটের চেয়েও সরল কণ্ঠে তখন তাঁরা বলতে পারতেন, 'লে' তা সে হু'—'ভারতবর্ষ? সে তো আমরা দু'ভাই!' বাদশা? যে কোনো গড্‌-ড্যাম আওরেঙ্গজেব-বংশের গর্ভস্রাব—!

নবীন রাজার অভিষেকের জন্য দুই ভ্রাতা তাঁর দুদিকে চলেছেন রাজার দুই বাহু ধরে। আল্লা জানেন, কার আদেশে তাঁর দুই বদ্ধমুঠি শিথিল করার ফলে এই এখন পায়রার দানা ঝরঝর করে দিওয়ান-ই-আমের পাথরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

চতুর্দিকে সৈয়দদের মিত্র ও পরামর্শদাতা আমীর-ওমরাহ তাঁদের মহামূল্যবান কিংখাবের পাগড়ী, শুভ্র মলমলের আঙ্গারাখা, তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নীচের সাচ্চা জরির বোনা সদরীয়ার সোনালী আভা, কোমরে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ শাল দিয়ে তৈরী কোমরবন্ধ, তার বাঁ দিকে গোঁজা জাঁতির মত জামদর অস্ত্র, ডাইনে ঝুলছে দিমিশ্‌কের তলোয়ার—খাপের উপর মুষ্টিতে বিচিত্র মণিমাণিক্যের জড়োয়া কাজ, পরনে সাটিনের পাজামা, পায়ে জরির কাজ করা শুড়-তোলা

সিলিমশাহী। উষ্ণীষে মুক্তোর সিরপেঁচ, বুকে মোতির হার, হাতে হীরের আংটি।

এদের ভিতর দিয়ে চলেছেন বাদশাহজাদা। পরনে নুনময়লা পাজামা, গায় মামুলী কুর্তা। ব্যস্। পাঁচ লহমা পরে যিনি হবেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! এ যে জগদীশ্বরের কৌতুকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন।

সৈয়দদের একজন শাহজাদার মাথায় বসিয়ে দিলেন তাঁর আপন পাগড়ী—মস্তকাভরণহীন অভিষেক কল্পনাতীত। সেই বিরাট সাইজের পাগড়ী শাহজাদার কান দুটো গিলে ফেলল। অন্য ভ্রাতা তাঁর মুক্তোর সাতলখা হার পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। ময়লা কুর্তার উপর সে মালা দেখালো ঘোলা জলের উপর রাজহংস!

এবং রফী উদ্-দরজাৎ এই বেশেই বসলেন—যা-তা সিংহাসনের উপর নয়—আসল ময়ূর সিংহাসনের উপর। এও আরেক রঙ্গ। কারণ সচরাচর মোগল বাদশারা বসতেন আটপৌরে সিংহাসনের উপর। ফররুখ সিয়ারের অভিষেকের বাৎসরিক পরব না অন্য কোনো উপলক্ষে তোষাখানা থেকে আগের দিন ময়ূর-সিংহাসন আনানো হয়েছিল; সেটা তখনো তোষাখানায় ফেরত পাঠানো হয় নি বলে যেন কনট্রাস্টটা চরমে পৌঁছনোর জন্য পাজামা-কুর্তা পরে শ্রীযুত রফী বসলেন তারই উপর!

এর পরের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ, আরো অচিন্তনীয়। কিন্তু তার ভিতর খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে যাবেন, কিন্তু এরকম কৌতুকজনক বড়-কিছু একটা পাবেন না। আমি একেবারে কিছু পাই নি। শুধু খুন আর লড়াই। নৃশংস আর বীভৎস। আমি তাই বাকিটা সংক্ষেপেই বলি—নিতান্ত যাঁরা ছোট গল্প পড়ার পরও শুধোন, 'তারপর কি হল?' তাঁদের জন্য।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শত্রুর শেষ রাখতে নেই বলে ফাঁসুড়ে পাঠিয়ে ফররুখ সিয়ারকে খুন করালেন। এক বছরের ভিতরই ধরা পড়লো রফী উদ্-দরজাতের যক্ষ্মা। সে বছর যেতে না যেতেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর বড় ভাই রফী উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনিও ঐ বৎসরই মারা গেলেন। তারপর বাদশা হলেন মুহম্মদ শাহ বাদশাহ। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতাদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন, অন্যজন বন্দী অবস্থায় বিষপ্রয়োগবশতঃ।

বস্তুত এ যুগের ইতিহাস পড়লে বার বার স্মরণে আসে:

রাজত্ব-বধূরে যে-ই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন!

দ্বিজ

এই গত শারদীয়া বেতার জগতে 'কোষ্ঠীবিচার' নামক একটি কথিকা এ-অধম নিবেদন করে। বিবরণটি ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত। তৎসত্ত্বেও আমার এক দোস্ত সেটি পড়ে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হন। আমি সবিনয় বললুম, 'ব্রাদার, এটা বরহক্ জলজ্যান্ত ঘটেছিল; আমাকে দুষছো কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সেটি রসস্বরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছ; সেক্ষেত্রে সত্যি-মিথ্যের কোনো অজুহাত নেই।' একদম খাঁটি কথা। তাই এবারে কিন্তু যেটি নিবেদন করবো সেটি পড়ে তিনি প্রসন্ন হবেন, এমত আশা করি, আর আপনারা পাঁচজন তো আছেনই। এই সুবাদে আরেকটি সামান্য বক্তব্য আমার আছে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী কাউকেই আমি বেদনা দিতে চাই নে। দিলে সেটা অজানিত এবং তার জন্যে এইবেলাই বে-কৈফিয়ৎ মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য দুষ্টবুদ্ধিজনিত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি সংহরণ করতে আমি অক্ষম—এটা গুরুর আদেশ।

এদানির কিছু লোক আবার আমার কাছ থেকে প্রাচীন দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ভালোমন্দ শুনতে চান। আমি তাঁদের লুক্কায়িত বক্তব্যটিও বিলক্ষণ মালুম করতে পেরেছি; সেটি এই, 'যা বুড়োচ্ছ, দুদিন বাদেই ভীমরতি ধরবে এবং তখন হয়ে দাঁড়াবে একটি চৌকশ "লিটারারি বোর"; যত্তবধি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার আপন কথা ধানাই-পানাই না করে আশ্রমের কথা কও, গুরুদের কথা কও ইত্যাদি।'

তাই সই। দেশকাল ঠিক ঠিক রাখবো। পাত্র ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।

১৯২০।২১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলেজ কোর্স খোলেন। ঐ সময় গাঁধীজী সরকারী ইস্কুল কলেজের পড়ুয়াদের গোলামী-তালিম বর্জন করতে আহ্বান জানান। ফলে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে যে সব মেধাবী ছিল, গাঁধীজীর বাণী গ্রহণ করলো তারা, জমায়েৎ হল শান্তিনিকেতনে। আর এলেন কয়েকটি খাজা মাল, যাঁরা বছরের পর বছর পৌনঃপুনিক দশমিকের পাইকিরি হিসেবে বেধড়ক ফেল মেরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য এদের একজন বলেছিল, 'ঐসন্ এ্যানসার বুক লিখেছিলুম, স্যর, যে এগজামিনার বললে "এনকোর"। তাইতে ফের একই পরীক্ষা দিতে হল।' এঁদের মধ্যে আমার মত গুণ্ডাপ্রকৃতির দু-চারটি কাবেল সন্তান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এলেন বিশ্বনাথ তিরুমল রাও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ থেকে। এঁকে নিয়ে যখন দু'দলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তখন ধরা পড়লো ইনি বরের পিসি, কনের মাসি। অর্থাৎ ইনি যেমন অনেকটা ইন্দ্রনাথের মত অন্ধকার রাস্তায় স্যাডিস্ট ক্লাস-টীচারের মাথায় হঠাৎ কম্বল ফেলে তাকে কয়েক ঘা বসিয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে এখানে চলে আসেন, ঠিক তেমনি কলাভবনে প্রবেশ করার পর দেখা গেল, তিনি একই হাতে পাঁচটা তুলি নাচাতে পারেন—যাদুকররা যেমন পাঁচটা বল নাচায়। স্কেচে ওস্তাদ, ফিনিশে তালেবর।

তদুপরি আরেকটি অতিশয় আশ্রমপ্রিয় সদ্‌গুণ তাঁর ছিল, যার প্রসাদাৎ তিনি সর্বত্রই কল্‌কে পেতেন। উচ্চতায় যদ্যপি পাঁচ ফুট দুই, কিন্তু পেশীগুলো যেন মানওয়ারি জাহাজের দড়া দিয়ে তৈরী, এবং ফুটবলে চৌকশ। বীরভূমের কাঁকরময় গ্রাউণ্ডে ডজন খানেক আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে রক্তলাঞ্ছন আঁকার পরও তিনি বুলেটবেগে ছুট লাগাতে কসুর করতেন না এবং হাসিমুখে। বিচক্ষণ জন সে হাসিতে নষ্টামির গোপন চিহ্ন দেখতে পেত।

আমাদের দোস্তি প্রথম দিন থেকেই। নাম যখন শুধালুম সেটা দ্রুতগতিতে দায় সারার মত বলে নিয়ে জানালে, 'ওটা তোলা নাম। আমার ডাকনাম চিন্নি। তোমার?'

'সীতু।'

পরবর্তী যুগে চিন্নি, ওরফে মিঃ রাও, স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দিল্লীতে কাজ করে। তার ভুলে ভর্তি অনর্গল বাঙলা কথার তুবড়িবাজি রাশভারি শ্যামাপ্রসাদের মুখেও কৌতুকহাস্য এনে দিত এবং বিশেষ করে ঐ কারণেই তিনি চিন্নিকে মাত্রাধিক স্নেহ করতেন। চিন্নি উত্তম ইংরিজি বলতে পারত, কিন্তু তার বক্তব্য, দিল্লীর মন্ত্রণালয়ই হোক আর ভুবনডাঙার ঝুরঝুরে চায়ের দোকানই হোক, সে তার শান্তিনিকেতনে শেখা বাঙলা ছাড়বে কেন? স্বয়ং গুরুদেবের সঙ্গে সে বাঙলায় কথা কইত নির্ভয়ে—চারটিখানি কথা নয়, এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করে, চিন্নির ডজন ডজন ভুল-ভর্তি বাঙলা সম্বন্ধে বলতেন, 'রাও কিন্তু তার বাঙলা প্রতিদিন ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে।' অর্থাৎ ভুল বাড়ছে!

শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব রিজাইন দিলে পর চিন্নিও তার জুতো থেকে দিল্লীর ধুলো ঝেড়ে ফেলে মাদ্রাজ চলে যায়। সেখান থেকে ইউনেস্কোর আহ্বানে তাইল্যাণ্ড, কলম্বো, জিনীভা, ওয়াশিংটন, বাগদাদে কীর্তিজাল বিস্তার করে।

সে যে দড়মালে তৈরী সেটা আশ্রমে তার আঠারো বছর বয়সেই ধরা পড়ে। সেখানে ইস্কুলের ছেলেরা দুবেলা উপাসনা করে; প্রস্তাব হল আমাদেরও করতে

হবে। চিন্নি উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল সে নাস্তিক। ফৈসালা করার জন্য আমাদের মীটিং বসলো। প্রিন্সিপাল মেসেজ পাঠালেন, তিনি চান, আমরা যেন উপাসনা করি। চিন্নি বললে, 'ইস্কুলের ছেলেদের বাপ-মা উপাসনার কথা জেনেশুনেই বাচ্চাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের অধিকাংশই এসেছি তাঁদের অমতে (এ কথাটা খুবই খাঁটি; আমাদের গার্জেনদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারী চাকুরে; তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেন কি প্রকারে? আমার পিতাকে তো ইংরেজ রীতিমত ভয় দেখায়)। আমরা সাবালক; আমি নাস্তিক।' চিন্নি পার্লামেণ্টেরেনও বটে—তার দোস্ত মসোজীকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, 'তুমি তো ক্রীশ্চান; তোমার সর্ব প্রার্থনা পাঠাতে হয় প্রভু যীশুর মাধ্যমে। আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেবে কি করে?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো মিয়া ভাই (মুসলমান)! পাঁচবেকৎ নেমাজ করিস' (করবো বলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলুম)। সভাপতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর ঘাড়ে আরো দুটো চাপানো কি ধর্মসম্মত?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। রেভারেণ্ড এ্যানড্রুজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সভাকে রাজী করাতে। পাদ্রীসাহেবের যাবতীয় স্কিল, তদুপরি তাঁর সরল আন্তরিকতা, তিনি সবকিছু প্রয়োগ করে খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। কিন্তু ভোটে চিন্নিপন্থীরা কয়েকটি ভোটে জিতে গেল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হ'ল, গুরুদেব যা আদেশ দেবেন তাই হবে। এ্যান্ড্রুজ সাহেবকেই আমরা দূত করে পাঠালুম।

গুরুদেব মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—'না'।

এই গেল চিন্নির পরিচয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে এল অন্ধ্র থেকে। মাধব রাও। সেও চমৎকার ফুটবল খেলে।

* * *

রাজ রাজমহেন্দ্রবরাম নগর—অর্থাৎ রাজমনড্রীর শ্রীযুত জগন্নাথ রাও চিন্নির বন্ধু। তিনি চিন্নিদের বাড়ির ছেলের মত। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ব্রাহ্মছাত্র অন্ধ্রদেশের শ্রীযুত চালামায়া গুরুদেবের প্রচুর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা অনবদ্য তেলুগুতে অনুবাদ করেন। জগন্নাথ রাও সেগুলো পড়ে আকণ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চিন্নির আশ্রমাগমনের ফলে তাঁর আশ্রমদর্শনের সদিচ্ছা প্রবলতর হল। চিন্নিকে আকস্মিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাকে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে শুধু চিন্নির পিতামাতাকে জানিয়ে এক শুভপ্রাতে রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

কলকাতায় উঠলেন বড়বাজার অঞ্চলে এক অন্ধ্র মেসে। সেখানে শুধোলেন, শান্তিনিকেতন কি প্রকারে যেতে হয়? কেউ কিছু জানে না বলে টাইমটেবল যোগাড় করা হল—সেখানেও শান্তিনিকেতনের সন্ধান নেই। তখন একজন বললে, কাছেই তো পোয়েটের বাড়ি; সেখানে গেলেই জানা যাবে। শ্রীযুত জগন্নাথ রাও তাই করলেন। সেখানে দেখেন 'বিশ্বভারতী পাবলিকেশন্‌স' দফতর খোলা বটে, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। শেষটায় একটি ছোকরা কেরানীকে আবিষ্কার করা হলে সে বললে, হাওড়া থেকে যেতে হয়, সে কখনো ওখানে যায় নি। যাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা সবাই গেছেন শ্মশানে। শান্তিনিকেতনের কে এক মিস্টার রাও সেই ভোরে হাসপাতালে মারা গেছেন।

জগন্নাথ রাও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। সম্বিতে ফিরে আর্তকণ্ঠে শুধোলেন, 'কে?' ছোকরাটি বললে, বড়ই দুঃখের বিষয়। মিস্টার রাও আশ্রমের হয়ে ফুটবল খেলতে যান শিউড়িতে। সেখানে খেলাতে জোর চোট লাগার ফলে তাঁর হার্নিয়া স্ট্রেন্‌গুলেটেড্‌ হয়ে যায়। এ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এখানকার হাসপাতালকে জরুরী চিঠি লিখে লোকজন সহ তাঁকে পাঠান কাল রাত্রে। সবই করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

জগন্নাথ রাও টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। চিন্নি ওয়াল্‌টেয়ারে আরেকবার এই রকম খেলার মাঠে বেহুঁশ হয়।

রাস্তা থেকে আবার ফিরে গেলেন ছোকরাটির কাছে। শুধোলেন, 'তার বাড়িতে তার পাঠানো হয়েছে?' ছোকরাটি বললে সে জানে না।

জগন্নাথ রাও মেসে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। দেশবাসীরা পরামর্শ করে তাঁর কথামত চিন্নির বাড়িতে তার পাঠালেন দুঃসংবাদটা জানিয়ে।

জগন্নাথ রাওয়ের কোনোই ইচ্ছা আর রইল না শান্তিনিকেতন যাবার, কিন্তু তিনি পরিবারের বন্ধু—এখন এত দূর কলকাতা অবধি এসে যদি সবিস্তার খবর নেবার জন্য সেখানে না যান তবে সবাই দুঃখিত হবেন।

নিতান্ত কর্তব্যের পীড়নে জগন্নাথ রাও হাওড়া গিয়ে, বোলপুরের ট্রেন ধরলেন।

বিকেলের দিকে যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন গেস্ট্‌ হাউসে হিতলাল (বর্তমান কালোর দোকানের কালোর পিতা) ভিন্ন কেউ ছিল না—হিতলাল ইংরিজি জানে না। জগন্নাথ বিছানাপত্র সেখানে রেখে বেরুলেন কলাভবনের সন্ধানে। চিন্নি তাঁকে কলাভবনের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখত।

সে কলাভবন বাড়ি আর নেই। তবে তার ভিতটা এখনো দেখতে পাওয়া

যায়, গুরুদেবের 'দেহলী' বাড়ির কাছে, বোলপুর যাবার রাস্তার পাশে।

কলাভবন সে সময়টায় নির্জন থাকে। নিচের তলায় কাউকে না পেয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে সেখান থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন,—

আমি যাচ্ছিলুম বোলপুর—নস্যি কিনতে; হঠাৎ শুনি, সেই অবেলায় কলাভবনে শোরগোল, স্পষ্ট চিনতে পেলুম আর্টিস্ট রমেন চক্রবর্তীর গম্ভীর গলা। কিন্তু আর্ত কণ্ঠে…তুমি যাও, শিগগীর যাও, জল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণে দেখছি,—

তিন লম্ফে সেখানে পৌঁছে দেখি, চিন্নি 'দেহলী' বাড়ির দিকে কালবোশেখী বেগে ছুটেছে। আমি সেদিকে খেয়াল না করে সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানে উঠে দেখি কে একজন লোক দু'পা ইয়া ফাঁক আর দু'হাত ওয়া লম্বা করে ধূলি-শয়নে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জোয়ারের সমুদ্র বেলাতটকে মড়া ফিরিয়ে দিলে সে যেরকম শুয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, 'চিন্নি, চিন্নি!' চক্রবর্তী বললেন, সে আবার কি? তিনি বিশ্বনাথ রাওয়ের ডাকনাম জানতেন না। আমি বুঝিয়ে বললুম। চক্রবর্তী বললেন, দেখো তো, সৈয়দ, ডাক্তার এসেছে কি না, বিকেলে তো মাঝে-সাঝে আসে। আমি বললুম, দেখি, মনে তো হচ্ছে ভিরমি কেটে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি, ওদের কেউই আর সেখানে নেই।

চিন্নি ভালো অভিনয় করতে জানে। রাত্রে তার ঘরে সে দেখালে জগন্নাথ রাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাকে দেখে—সে আর চক্রবর্তী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—থমকে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। দু'হাত দুদিকে দুটো হাঁটুর সঙ্গে এক তালে মৃগী রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্। চিন্নি বললে, 'অবশ্য আমার মুখেও জগন্নাথ বিস্ময় দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল আরো বেশী। ভাগ্যিস্ রমেনবাবু সঙ্গে ছিলেন! আমাকে ঐ আবছায়া আলোতে একলা-একলি দেখতে পেলে তার কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমার ভূত কলাভবনের মায়া কাটাতে না পেরে সন্ধ্যার নির্জনে সেখানে আবার এসেছে।'

হঠাৎ দেখি জগন্নাথ রাওয়ের মুখ একেবারে রক্তহীন, মাছের পেটের মত পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে যা বললেন তা শুনে রমেনবাবুর মত ঠাণ্ডা মাথা স্থিরবুদ্ধির লোক পর্যন্ত অচল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে জগন্নাথের খেয়াল গেছে যে, তিনি চিন্নির বাপ-মাকে তার করে জানিয়ে বসে আছেন যে চিন্নি নেই।

আমি তেড়ে বললুম, 'আপনি তো আচ্ছা—নেভার মাইণ্ড!—রাও তো

আপনাদের দেশে প্রত্যেক সেকেণ্ড ইডিয়ট।'

জগন্নাথ বার বার বলেন, 'চিন্নি তো আমায় জানায় নি যে আরেকজন অন্ধ্রবাসী এসেছে। তার উপর ফুটবল, তারপর পেটে—'

রমেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওহে! এতক্ষণ তো খুব রগড় করলে! শোনো, ব্যাপারটা সিরিয়স! এ্যান্‌ড্রুজ সাহেবের কাছে যাও। আর কারো টেলিগ্রাম বাপ-মা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। গুরুদেব তো বার্লিনে!'

সাহেব মোটেই চটলেন না। নাস্তিক চিন্নির জন্য খাঁটি খৃষ্টান ছ'পাতা লম্বা তার করলেন সব বুঝিয়ে। আর আমি চিন্নিকে তাঁর সামনেই বললুম, এবার প্রার্থনা করোগে, বাড়িতে যেন ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়। দুই অন্ধ্র ভাইজ্যাগ্‌ বাগের ট্রেন ধরলেন।

চিন্নি ফোকটে ছুটি মেরে হপ্তা তিনেক পরে ফিরল। আমরা শুধালুম, 'কি, আপন ছেরাদ্দ সাঁপটাবার মত ঠিক সময়ে পৌঁচেছিলি তো? হুঁকোটা লে, খুলে ক'!'

চিন্নি বললে, 'টেলিগ্রাম পৌঁচেছিল দেরিতে। ইতিমধ্যে দাদাকে আনানো হয়েছে মাদ্রাজ থেকে। বাড়িতে কান্নাকাটি সে আর কি বলতে—অবশ্য আমার শোনা কথা। যেদিন তার পৌঁছল সেদিন বামুন এসেছে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। আর ট্র্যাজেডিটা দেখ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে এমনি বিকল যে, কে একজন তারটা সই করে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছে, ঘণ্টা দুই কেউ খোলে নি, ভেবেছে, কি আর হবে, কণ্ডলেন্‌স্‌-টেন্‌স্‌। খুলেছিল শেষটায় আমার ছোট ভাই। সেও নাকি প্রায় ঐ জগন্নাথ রাওয়ের মত পাঙাশ মেরে রাম ইডিয়টের মত গা-গা ডাক ছেড়েছিল। বাকিরা ভাবলে, আবার কে মরলো? তারপর কেউ বিশ্বাস করে না তারটাকে, যদিও সবাই করতে চায়। এ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এত বিখ্যাত লোক, তিনি আমাদের চিন্নিটার জন্য ইত্যাদি…।'

শেষটায় বিশ্বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত কারো কারো মনের ধোঁকা কাটে নি।

রাত্রে ছাতের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি দু'জনাতে। আমি বললুম, 'চিন্নি, ঘুমুলি?'

'না।'

'আর তোর মা?'

'বিশ্বাস করবি নে, সেটা ভারি ইন্‌ট্রেস্‌টিং। জগন্নাথ রাওয়ের তার পৌঁছনোর পর থেকেই মায়ের মুখে শুধু এক বুলি, "কিছুতেই হতে পারে না। আমার ছেলে

নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই তো বছরের পয়লা দিনে আমি গণৎকার ঠাকুরকে ফি বছরের মত এবারও সব ক'টা ছেলের কোষ্ঠী দেখিয়েছি। তিনি এবারও বলেছেন, চিন্নির সামনে ফাঁড়াটি পর্যন্ত নেই"।'

চিন্নি বললে, 'যখন পুরুতঠাকুর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছে তখনো তার মুখে ঐ এক বুলি, "কি হবে এসব ব্যবস্থা করে? গণৎকার বলেছে, এ বছরে চিন্নির জ্বর-জ্বালাটি পর্যন্ত নেই"।'

কে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বোঝাবে চিন্নি নেই?

আর শ্রাদ্ধে যা টাকা খরচা হওয়ার কথা ছিল সেটা মা দিয়েছে গণৎকারকে।